# মহিয়সী মহিলা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
মাণিকতলা স্কোয়ার, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—কালিকা প্রেস ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উপহার



মানব-সভ্যতার প্রথম দিন হইতে যে নারী

জননী জায়া ভগিনী দুহিতারূপে,

সুজাতার মত প্র-বুদ্ধ চিত্তের পরমান্ন লইয়া

যুগে যুগে নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন

মানব ইতিহাসের নামহীনা

সেই অন্তঃপুরলোকবাসিনীদের

উদ্দেশ্যে

এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম

# মহিয়সী মহিলা

# মহিয়সী মহিলা

## বিশ্ববারা

সভ্যতার প্রথম যুগে আর্য্য নারীগণ গভীর উদাত্ত স্বরে যে-সমস্ত বেদ-মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, শত শত যুগ ধরিয়া আজিও তাহা মানব চিত্তে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। কল্পনার নেত্রে দেখিতেছি ভারতের তপোবনে তপোবনে প্রজ্বলিত হোমাগ্নির চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া শুভ্র-উষায় নারী অমর বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে—হোম-পুষ্ট অগ্নি সেই বেদ-মন্ত্রকে উর্দ্ধলোকে লইয়া চলিয়াছে। আর্য্য সভ্যতার সে পূত শুভ্রতা সহযাত্রী নারীর কল্যাণ-মহিমা স্বরূপ আজিও সেই সমস্ত অমর মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে বিরাজ করিতেছে।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্তটী অত্রিগোত্রজা ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা রচনা করেন। মন্ত্রের প্রথমে বলা হইয়াছে, অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত শিখা বিস্তার করিয়া প্রখর দীপ্তি

ধারণ করিয়াছে। উষাকালে অগ্নির প্রশস্ত শিখা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা ঘৃতাধার-হস্তে অগ্নি-পরিক্রমণ করিয়া ইন্দ্রাদি অমর দেবগণের স্তব করিতেছেন

হে অগ্নি, উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য বিস্তার কর। হোতার মঙ্গলের জন্য তুমি তাহার সন্নিকটে থাক

হে অগ্নি, আমাদের কল্যাণের জন্য তুমি প্রসন্ন হও। তোমার কৃপায় যেন আমরা ঐশ্বর্য্যশালী হই। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। তোমার তেজঃ সম্পত্তি আরও সমৃদ্ধ হউক। তোমার দীপ্ত শিখা যেন প্রেমকে আরও প্রগাঢ় করে। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন পতি ও পত্নী কদাপি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়।



# ঘোষা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্ত কাক্ষী-বানের কন্যা ঘোষা সঙ্কলন করেন। সুদূর অতীতের সে কোন্ এক স্বর্ণ-উষায় ঋষি-কন্যা যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন, কুমারী নারীর অন্তরের শাশ্বত কামনা তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে আহ্বান করিয়া ঘোষা বলিতেছেন, হে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, আপনাদের অনুগ্রহে আজ ঘোষা পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ঘোষা যেন উপযুক্ত পতি পায়। আপনাদের আশীর্বাদে ঘোষার ভাবী পতির হিতার্থ যেন আকাশ হইতে প্রচুর বারি বর্ষণ হয়— যাহাতে তাঁহার শস্যক্ষেত্র উর্বর হইয়া উঠে। আপনাদের



অনুগ্রহ-দৃষ্টি যেন তাহার ভাবী পতিকে শত্রুর হিংসা হইতে রক্ষা করে। যৌবন-সুন্দর পতিকে লইয়া ঘোষার যৌবন যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। ঘোষা যেন চির-যৌবনা হয়।

হে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, পিতা যেমন সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করে, আপনারা তেমনি আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করুন। আমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেহ নাই, আত্মীয়-মিত্র বান্ধব কেহ নাই। আমি জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা। আপনাদের আশীর্ব্বাদ যেন আমাকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করে।

কন্যা-সম্প্রদান-কালে পিতা যেমন কন্যাকে উত্তম বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ আমিও এই স্তব-মন্ত্র দ্বারা আপনাদের অলঙ্কৃত করিলাম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন আমার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দিন-যাপন করে। পতিগৃহে গমন করিয়া আমি যেন পতির প্রিয়পাত্র হই।

## সূর্য্যা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটী সূর্য্যার দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঘোষার মন্ত্রে যেমন কুমারী নারীর অন্তরের কামনা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যার ঋকে তেমনি বিবাহিতা নারীর একটী অপরূপ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যার মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য হইতেছে যে, সূর্য্যা যখন বিবাহের পর পতিগৃহে যায়, তখন তাহার সঙ্গে কোন সহচরী ছিল না। শুধু রৈভী নাম্নী মন্ত্রকে সে আত্মার সহচরী করিয়া লইয়া যায়। আত্মার এত বড় সহচরী আর কে হইতে পারে? তাহার অঙ্গে কোনও মূল্যবান্ উজ্জ্বল পট্ট-বসন ছিল না। তাহার সামান্য বসন সাম-মন্ত্রপূত হইয়া অসামান্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অপেক্ষা মহার্ঘ্য বসন আর কি হইতে পারে? তাহার

সুস্নিগ্ধ আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন যুগলই ( তৈল হরিদ্রাদি ) অভ্যঞ্জন স্নেহদ্রব্য স্বরূপ তাহাব সহিত চলিল স্বর্গ ও পৃথিবী তাহার অলঙ্কারের আধার কোষ পেটিকা হইল। নিষ্কলুষ অন্তরের যানে সূর্য্যা পতিগৃহে চলিল—মাথার উপরে আকাশ সে যানের আচ্ছাদান স্বরূপ রহিল। সূর্য্যার প্রার্থনা, হে ইন্দ্রাদি দেবগণ, আমাদের বন্ধুগণ বিবাহার্থ পাত্রী অন্বেষণে যে সকল পথে আগমন করে, তাহা যেন নিষ্কণ্টক হয়।

*সূর্য্যার স্তবে বধূরূপের সে অপরূপ কল্যাণী মূর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া যুগ-যুগান্তরের তরঙ্গ-স্রোতের পারে দাঁড়াইয়া আজ আনন্দ-সুন্দর-চিত্তে অনিন্দ্যসুন্দর হে সূর্য্যা, তোমাকে নতি জানাইতেছি।



# ইন্দ্রাণী ও শচী



ইন্দ্রাণী ও শচীর সঙ্কলিত ঋকে সপত্নী-ভয়ের বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। জগতে কোনও নারীর যেন সপত্নী না হয়, তাহার জন্য এই দুই নারী আর্য্য-সভ্যতার প্রথম যুগে দেবতাদেব স্তব করিয়াছিলেন। বেদ-মন্ত্র-সঙ্কলয়িতা ইন্দ্রাণী ও শচীর প্রার্থনা এককালে এই বেদমন্ত্রপূত ভারত-ভবনে যে কি ভাবে ব্যর্থ হইতে পারে তাহা হয়ত তাঁহারা সেদিন ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রাণী ও শচীর প্রার্থনা বোধ হয় জগতের নারীর অন্তরের সত্য প্রার্থনা, তাই মহাকাল আজ তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে চলিয়াছে।

# যমী

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তটী যমী সঙ্কলন করেন। এই মন্ত্রে বীর নারীর অন্তরের প্রার্থনার কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। যমী প্রেত-লোকের দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যুদ্ধনীতি-অনুসারে সংগ্রাম করিয়া যাহারা রণ-ক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন্, আপনি তাঁহাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করুন। যাঁহারা শত পুণ্যকর্ম্মে জীবন আহুতি দিয়াছেন, যাহাদের তপঃ-প্রভাবে সূর্য্যদেব রক্ষিত হইতেছেন, যাহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া শুধু তপস্যাই করিয়া গিয়াছেন, হে কৃতান্ত, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য আপনি তাঁহাদের নিকট গমন করুন।



# রোমশা

রোমশার প্রার্থনায় জগতের রূপহীনা নারীর এক সকরুণ আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্ব গাত্রে রোমাবলী ছিল বলিয়া স্বামী তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সেই জন্য রোমশা একদিন স্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে স্বামী,, আমার গাত্রে বেশী লোম থাকিলেও আমি তো পূর্ণাবয়বা নারী!



সুদূর অতীতের অনাদৃতা রূপহীনার অন্তরের ক্রন্দন এই সামান্য উক্তিতে আজিও সকরুণ হইয়া বহু চিত্তে বাজিয়া উঠিতেছে। 'আজিকার জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রোমশার অন্তরের প্রার্থনাকেই নবছন্দে গাহিয়াছেন,— 'রূপহীনা নহে প্রেম-হীনা'।

# গার্গী

রাজর্ষি জনকের রাজ-সভায় সেদিন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ঋষি, তাপস সকলেই উপস্থিত বেদাদি আলোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজর্ষি জনক সুবর্ণ ভূষিত-শৃঙ্গ সহস্র গাভী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে উপহার দিবার বাসনায় বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই সমস্ত সুবর্ণ-ভূষিত-শৃঙ্গ গাভী উপহার গ্রহণ করুন।



মহর্ষি জনকের এই ঘোষণা শুনিয়া ঋষিগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতঃপর মহাজ্ঞানী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ ঘোষিত করিয়া সেই উপহার লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সেই সময় সমাগত ঋষি তাপস ও জ্ঞানীদের মধ্যে একজন যুবতী নারীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নাম গার্গী। বচক্লু নামক মুনি তাঁহার পিতা। শিশুকাল হইতে গার্গী শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকেন এবং যৌবনে তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রকাশ্য সভায় ঋষি-শ্রেষ্ঠদের সহিত জটীল তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় দেখিয়া সকল জ্ঞানী, ঋষি ও তাপসদের মধ্য হইতে সেদিন ভারতের এক নারী অগ্রসর হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিযোগী প্রতিভা হিসাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা জটীল বিষয় লইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর মধ্যে তুমুল তর্ক চলিল; গার্গীর প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরাজয় স্বীকার করিলেন।

সেদিন ভারতের নারী প্রকাশ্য সভায় প্রতিভার বলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বলিয়া পরিচিত

# মৈত্রেয়ী

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। তিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানমহিমায় সন্তুষ্ট হইয়া মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক প্রভৃত গোধন ও রত্নসম্ভার দিয়াছিলেন। বহুবার তিনি মহারাজ জনকের নিকট হইতে সুবর্ণ-ভূষিত-শৃঙ্গ সহস্র ধেনু পাইয়াছিলেন।

শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পত্নী বর্ত্তমান থাকিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পত্নীর অনুমতি লইতে হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, একজনের নাম মৈত্রেয়ী আর একজনের নাম কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী বিবাহিত জীবনে শুধু স্বামীর সেবা-সঙ্গিনী ছিলেন না, তিনি স্বামীর সহিত একসঙ্গে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দুরূহ শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত।



দুই পত্নীকে আহ্বান করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার অন্তরের বাসনা নিবেদন করিয়া বলিলেন, আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাই। তাহার পূর্ব্বে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দুইজনকে ভাগ করিয়া দিতে চাই, যাহাতে তোমাদের কোন কষ্ট না হয়।

স্বামীর বাসনা অবগত হইয়া মৈত্রেয়ী সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি আপনার গো স্বুবর্ণ-গৃহ-ক্ষেত্রাদি ধন লইয়া কি করিব ? ইহাতে কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ?

পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি তোমার অভীষ্ট জানিতে পারি কি ?

মৈত্রেয়ী বলিলেন, আমি অমর হইতে চাই। আমি অমৃতত্ব-প্রার্থিনী নারী। নশ্বর ধন-সম্ভার লইয়া আমি কি করিব ? যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর অন্তরের এই পরম-জিজ্ঞাসায় সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তি সাধনার পথে মৈত্রেয়ীকে সঙ্গে লইলেন।

সেই অমৃতত্ব-প্রার্থিনী নারীর পরম-জিজ্ঞাসার মধ্যেই ভারতের সমগ্র সাধনার পরিপূর্ণ প্রকাশ রহিয়া গিয়াছে—যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

## সঙ্ঘমিত্রা

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্র নৃপতি মহারাজ অশোক সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুকাল পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ভগবান্ গৌতমের পুণ্যবাণী জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার পার্থিব সমস্ত কিছুই উৎসর্গীকৃত করেন। তাঁহার দুই সন্তান, একপুত্র, নাম মহেন্দ্র, কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা ভারত-সম্রাটের সন্তান হইয়াও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর পীত-বাসে তাঁহাদের দেহ শোভিত

করিতেন এবং যৌবনেই ভগবান্ গৌতমের পুণ্যবাণী-ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন।

বুদ্ধ-মহিমা প্রচার-কল্পে মহারাজ অশোক তাঁহার রাজ্যের মধ্যে চুরাশী হাজার বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। যেদিন সেই চুরাশী হাজার বিহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেল, সেই দিনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক মহাদান-মহোৎসব নামক এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিলেন। সম্রাটের আদেশ-অনুযায়ী সমগ্র রাজ্যের মধ্যে সাতদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিবে। প্রত্যেক নগরী দীপমালা ও পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত করিতে হইবে। যাহার যেমন সামর্থ্য, এই সাত দিনের মধ্যে তাহাকে এই চুরাশী হাজার বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তেমনি আনন্দ-চিত্তে ভিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক জনপদে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, ভগবান গৌতমের পুণ্যবাণী সপ্তাহ কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইবে। সপ্তম দিবসে মহারাজ স্বয়ং রাজমার্গে বহির্গত হইয়া প্রজাদের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিবেন। উক্ত দিন ভিক্ষুকদের বিশেষ ভাবে কিছু দান করিতে হইবে। তাহাই হইবে মহাদান।

মহাদান-মহোৎসব উপলক্ষে রাজধানী পাটলীপুত্রে ভারতের নানা স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। সাত দিন ধরিয়া পুষ্প-সৌরভের সহিত মিশিয়া ভগবান্ গৌতমের পুণ্যবাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিয়া উঠিল।

সপ্তম দিবস—মহাদানের দিন। মহারাজ অশোক ভিক্ষুর বেশে রাজপথে বাহির হইলেন। নগরীর মধ্যস্থলে এক বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে সমাগত সুধীবৃন্দ সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় উপস্থিত। বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে মহারাজ অশোক সেই

মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন সহস্র সহস্র কণ্ঠে ভগবান বুদ্ধের নাম ধ্বনিয়া উঠিল।

মহারাজ অশোক সিংহাসনে উপবেশন করিবার পর সভা মধ্যে মহাজ্ঞানী ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহাস্থবির তিষ্য প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিষ্যকে সমাগত দেখিয়া মহারাজ অশোক সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন ভিক্ষুর চরণ যুগলে ভারতের সম্রাট মস্তক নত করিলেন।

তারপর সিংহাসনের নিম্নে মহাস্থবির তিষ্যের নিকটে এক সাধারণ আসনে মহারাজ উপবেশন করিলেন।

অতঃপর সমাগত ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মুখে মহারাজ অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ তথাগতের সেবকদের মধ্যে কাহার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?"

শত সহস্র কণ্ঠে উত্তর ধ্বনিয়া উঠিল, "মহারাজ অশোকের!"

সেই সম্মিলিত ধ্বনি শান্ত হইলে, মহা স্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি আপনার পুত্র বা কন্যাকে স্বেচ্ছায় ধর্ম্মার্থ একান্তভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ গৌতমের সেবকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।"

মহারাজ অশোক ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। রাজকুমার মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট তাঁহাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিক্ষু ধর্ম্মগ্রহণ করিতে তোমাদের ইচ্ছা আছে কি?

সঙ্ঘমিত্রা ও মহেন্দ্র অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, বহুদিন হইতেই আমরা দুই জনে ভগবান্ তথাগতের নিকট মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলেই আমরা দুইজনে ভিক্ষু-ব্রত লইয়া আজও যে দেশে ভগবান তথাগতের বাণী পৌঁছায় নাই, সেই খানে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাই।

মহারাজ অশোক পুত্র ও কন্যার উত্তরে সভামধ্যে ঘোষণা করিলেন, আপনারা সকলে সাক্ষী, ভগবান তথাগতের নামে আমি আমার পুত্র ও কন্যাকে সমর্পণ করিলাম।

সভামধ্যে তুমুল আনন্দের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহাস্থবির তিষ্য মহেন্দ্রের শিক্ষার ভার লইলেন এবং ভিক্ষুণী ধর্ম্মপালী সঙ্ঘমিত্রার ভার লইলেন।

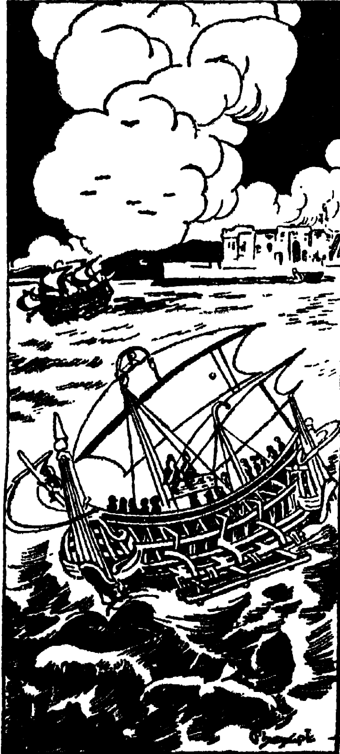
ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিলে, মঠ ভিন্ন অন্য কোনও গৃহস্থ আবাসে থাকিবার নিয়ম নাই। সেই জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা তাঁহাদের মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে ভিক্ষুণীর বেশে চির-বিদায় দিতে মাতার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি স্বেচ্ছায় এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছ ?

সঙ্ঘমিত্রা বলিলেন, শুধু স্বেচ্ছায় নয়; এই ব্রত গ্রহণ করাই আমাদের আকৈশোরের সাধনা ছিল।

ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশের নাম উপসম্পদা। রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া উপসম্পদা-মন্দিরে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা গভীর শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হইলেন, এবং মহেন্দ্রের পূর্ব্বে সঙ্ঘমিত্রা 'অর্হৎ' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর মহারাজ অশোকের অনুজ্ঞা লইয়া মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহারা সিংহল দেশের মিশ্র পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেদিন দৈব-যোগে সিংহলের রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য সৈন্য-সামন্ত পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা জানিতে পারিলেন যে অদূরেই সিংহলের রাজা মৃগয়াব্যপদেশে রহিয়াছেন। মহেন্দ্র অন্বেষণে রাজাকে একাকী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ওহে তিষ্য—কোথায় যাইতেছ



সহসা বন-মধ্যে নাম ধরিয়া ডাক শুনিয়া রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, সমগ্র বন উজ্জ্বল করিয়া গৈরিক বসনে এক যুবক ও যুবতী। তাহাদের মুখশ্রী ও ভঙ্গিমা দেখিয়া রাজা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সম্ভ্রমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা?

—মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের নিকট হইতে আমরা আসিয়াছি। আমরা ভ্রাতা ও ভগিনী ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আপনার রাজ্যে ভগবান্ তথাগতের অমৃত-বাণী প্রচার করাই আমাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। আমরা রাজ্য-জয় করিতে আসি নাই, সঙ্গে আমাদের সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, শুধু অন্তরে আছে ভগবান তথাগতের বাণী, তাহাই দিয়া চাই সিংহলের হৃদয় জয় করিতে।"

মহেন্দ্রের বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দেবপ্রিয় তিষ্য তাঁহাদের লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রা রাজ-অন্তঃপুরে গিয়া রাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সখীদের নিকট আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করিলেন। ভারতের সম্রাটের একমাত্র কন্যাকে ভিক্ষুণীর বেশে এই দুস্তর ব্রত-পালনে আত্ম-সমর্পিতা দেখিয়া রাজ অন্তঃপুরে সমস্ত মহিলা সঙ্ঘমিত্রার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজ-কুমারী অনুলা ভিক্ষুণী সাজিলেন।

সমগ্র সিংহলে এই অপূর্ব্ব দীক্ষা গ্রহণের কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল এবং সিংহলে দলে দলে নর-নারী বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

রাজকুমারী অনুলার ইচ্ছা-অনুসারে সঙ্ঘমিত্রা ভারতবর্ষ হইতে, যে বোধি-বৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধ নির্ব্বাণ-তত্ত্ব লাভ করেন, তাহার একটী শাখা আনাইয়া সিংহলে প্রতিষ্ঠা করেন।

দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া বিদেশে গিয়া সেদিন ভারতের রাজ-কুমারী ভিক্ষুণীর বেশে একটী রাজত্বের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

# মালিনী

বৌদ্ধযুগে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে মহারাজ কৃকী নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই সময়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষ বাঁধিয়া গিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মকে বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বর্জ্জন করিতেছিলেন। মহারাজ কৃকী তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহায়তায় পুনরায় বেদোক্ত ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন।

কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে রাজার একমাত্র

দুহিতা মালিনীর অন্তরে কেমন করিয়া ভগবান বুদ্ধের অমিত আলো আসিয়া লাগিয়াছে। রাজা মালিনীকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাখিয়া সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন। কিন্তু মালিনীর মুক্তি-পিপাসু আত্মা ভগবান গৌতমের চরণ-প্রান্তের দিকে চাহিয়া ছিল গোপনে বেদোক্ত-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া রাজ-অন্তঃপুরে আপনার মনে মালিনী বোধি বৃক্ষ-তলে উপবিষ্ট সেই মহাপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

রাজাজ্ঞা অবহেলা করিয়া একদিন মালিনী সমাগত পাঁচটা বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে পরম-সমাদরে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া আসিয়া স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বের তত্ত্ব আলোচনায় রত হইলেন। তৎপরে একান্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের বিদায় দিলেন।

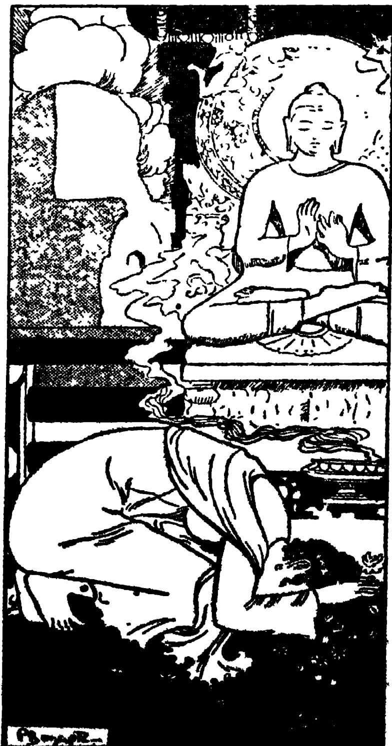
এই ঘটনা রাজার কাণে পৌঁছিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-সভার পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজকুমারী মালিনীর ব্যবহারে আপনাদের পরাজিত ও অপমানিত মনে করিলেন এবং তাঁহাদের ধারণা হইল যে রাজকুমারী গোপনে নিশ্চয়ই কোনও বৌদ্ধ রাজার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এবং সেই পাঁচজন ভিক্ষু নিশ্চয়ই গুপ্তচর হইবে। আর রাজকুমারী যখন তাঁহার পিতা, গুরুজন, সকলের ধর্ম্মকে এই ভাবে অবজ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহার কঠোর শাস্তি-বিধান হওয়া উচিত। বহু তর্ক-আলোচনার পর স্থির হইল যে রাজকুমারী মালিনীকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিতে হইবে।

মালিনী পিতার মুখে চির-নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা শুনিলেন। রাজার কুমারী এই ভয়াবহ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। গোপনে আনন্দে তাঁহার হৃদয়-মন দুলিয়া উঠিল, এতদিন পরে ভগবান অমিতাভ বুঝি দয়া করিলেন, সংসারের অনিত্য বন্ধন হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাণের পথে ডাকিয়া লইলেন।

বাহিরে বলিলেন, পিতা, আপনি আমাকে সাতদিন সময় দিন। এই সাতদিন আমি আপনার রাজ-সভায় আপনাব ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সম্মুখে আমাব অন্তরের কথা নিবেদন করিব। তারপর হাস্যমুখে আপনার দণ্ডাজ্ঞা শিরে বহিয়া এই রাজ্য হইতে চির-বিদায় লইব।

রাজা ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাহাতেই সম্মত হইলেন।

মালিনীর অন্তরে এতদিন যে বাধা ছিল, নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞায় তাহা বিদূরিত হইয়া গেল। মালিনী আপনার অন্তরে ভগবান বুদ্ধের পরম আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজসভাতলে রাজার সম্মুখে, সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সম্মুখে, যন্ত্রচালিতের মত মালিনী ভগবান্ তথা-গতের মহা-বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক



কথার সহিত এক দিব্য-জ্যোতি সমস্ত সভা-স্থলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিল। সাতদিন পরে কৃতাঞ্জলি-করপুটে রাজকুমারী মালিনী সর্ব্ব-অলঙ্কার বিমোচন করিয়া শুদ্ধ মাত্র গৈরিকবসন পরিহিতা হইয়া সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু রাজা, সভাসদ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহই বিদায় দিতে আব চাহেন না। ভগবান বুদ্ধের বাণী তাঁহাদেরও অন্তর স্পর্শ করিয়াছে।

অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা বলেন, হে কল্যাণী, রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না!

মালিনী বলেন, ভগবান অমিত ধর্ম্ম আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি সে মহা-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া আর এই অনিত্য মায়া-বন্ধনে বাঁধা থাকিতে চাহি না। ভিক্ষুণী হইয়া দেশে দেশান্তরে বুদ্ধের মহা-বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইব। এই আমার জীবনের মহাব্রত।

অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া রাজা শেষ বার অনুরোধ করিলেন, যদি একান্তই আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের নির্জ্জন-প্রদেশে তুমি থাক। সারনাথ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইও না।

সকলের অনুরোধে মালিনী তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সারনাথের নির্জ্জন প্রান্তরে দশসহস্র বৌদ্ধ মহিলার বাসোপযোগী এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মুক্তি-কামী মহিলাগণ সারনাথে আসিয়া জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগ্রহণ করিতে লাগিলেন। সারনাথ ভারতের নারী-শিক্ষার পীঠস্থান হইয়া উঠিল।

আজ সারনাথের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া সহসা মন অতীত যুগের কীর্ত্তির মধ্যে ডুবিয়া যায়। সেই অতীতের ভগ্ন-স্মৃতির মধ্যে বিচরণ

করিতে করিতে সহসা যেন কর্ণে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত দশ সহস্র মহিলার মিলিত স্তব-মন্ত্র-ধ্বনি বাজিয়া উঠে—রাজকুমারী চির-ভিক্ষুণী মালিনীর গৈরিক-বাসের বর্ণ সমস্ত নিৰ্জ্জনতাকে এক পীত গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তোলে

# উভয়ভারতী

বৌদ্ধ কাপালিকদের প্রভাবে ও নানাবিধ অনাচারে তখন ভারতবর্ষ হইতে বেদানুমোদিত ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময় ভগবান শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া অসামান্য প্রজ্ঞাবলে সমগ্র ভারতে পুনরায় বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-মতের নাম অদ্বৈতবাদ ; কারণ তিনি প্রচার করেন যে, এক নিত্য-ব্রহ্মই সত্য এবং এই দৃশ্যমান্ জগৎ মায়াময়।

তাঁহার এই মতকে সকলের নিকট গ্রাহ্য করাইবার জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। সেই সময়কার খ্যাতনামা প্রত্যেক পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া, শাস্ত্রালোচনার দ্বারা তাঁহাদের পরাজিত করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বিরাট প্রজ্ঞার আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক-বসন-পরিহিত শিখাযজ্ঞোপবীত-শূন্য যুবক ব্রহ্মচারীর প্রদীপ্ত জ্ঞান-শিখায় সমগ্র ভারতে সেদিন যে প্রভা সমুদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজও কোটী চিত্তে আলোক বিকীরণ করিতেছে।

সেই সময় উত্তর-ভারতে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী মাহিষ্মতী নামক নগরে

মণ্ডন মিশ্র নামে এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত উত্তর-ভারতে আর কেহ ছিল না। রাজা মহারাজারা নিত্য তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিয়া যাইতেন। সাধাবণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত তিনি দরিদ্র ছিলেন না। তিনি জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই বসবাস করিতেন।

এই মণ্ডন মিশ্রকে শাস্ত্রালোচনায় পবাজিত করিয়া স্বমতে আনিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য মাহিষ্মতী অভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

শঙ্করাচার্য্য যখন মাহিষ্মতী নগবীতে প্রবেশ কবিতেছিলেন, সেই সময় দেখেন তিন জন দাসী আসিতেছে। শঙ্কর তাহাদের নিকট মণ্ডন-মিশ্রের বাড়ী কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন উত্তর দিল, যে অট্টালিকার সম্মুখে দেখিবেন, সুবর্ণ-পিঞ্জবে শুকপাখী নিয়তই বলিতেছে,—বেদ নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ না প্রমাণ-সাপেক্ষ,—সেই অট্টালিকাই জানিবেন মণ্ডন মিশ্রের বাসভূমি।

শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডন মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মিশ্র মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সেবা করিতে-ছিলেন। সহসা তিনি দেখিলেন যে, সভামধ্যে এক অপূর্ব্ব তেজস্বী যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র মুখমণ্ডল হইতে এক জ্যোতি বাহির হইতেছে। পরিধানে গৈরিকবাস, কিন্তু গলায় যজ্ঞোপবীত নাই, মস্তক মুণ্ডিত কিন্তু শিখা-বর্জ্জিত।

যজ্ঞোপবীতশূন্য ও শিখাহীন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মণ্ডন মিশ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, শ্রাদ্ধকালে এইরূপ লোক দর্শন করা পাপ।

শঙ্করাচার্য্য তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; বরঞ্চ শাস্ত্রীয় আলোচনার একটা সুযোগ পাইলেন বিবেচনায় তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা নিজের কর্ম্মের সমর্থন করিতে লাগিলেন। সমগ্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর

সমক্ষে উত্তর-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের এক তুমুল শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলী সেই অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।



কিন্তু উপযুক্ত বিচারক বিনা কোনও তর্কের মীমাংসা হইতে পারে না। মণ্ডন মিশ্র ও শঙ্করচার্য্য যখন তর্কে নিবত, কে তখন বিচারক হইবে? সমাগত সমস্ত ব্রাহ্মণ আপনাদের জ্ঞানের দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, অন্তঃপুরে মণ্ডন মিশ্রের সহ-ধর্ম্মিণী উভয়-ভারতী আছেন, তাঁহাকে এই জ্ঞান-দ্বন্দ্বের বিচারক হইবার জন্য বলা হউক।

উভয়ভারতী পিতৃ-গৃহেই ফলিত জ্যোতিষ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং স্বামী-

গৃহে আসিয়া তিনি আত্মসাধনার বলে মগ্ন-জ্ঞান অর্জ্জন করেন উভয়ভারতী বিচারক হইতে স্বীকৃত হইলেন এবং পরদিবস বিচারের দিন ধার্য্য হইল।

মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান-গরিমা দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর যখন চলিয়া যাইতেছিলেন তখন মণ্ডন মিশ্র কাতর অনুনয়ে জানাইলেন, শ্রাদ্ধ-বাসবে কিছু ভিক্ষা গ্রহণ না করিলে, স্বর্গগত আত্মার অকল্যাণ হইবে।

পূর্ব্ব-তর্ক আবার উঠে দেখিয়া, হাসিয়া শঙ্কর বলিলেন, আপনি নির্ব্বিঘ্নে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সমাপন করুন আমার ভিক্ষা লওয়া বা না লওয়াতে তাহার কোনও ব্যাঘাত হইবে না আর আমি অন্নের বা স্বর্গের ভিক্ষু নহি। আমি জ্ঞান-ভিক্ষু, বিচার-ভিক্ষু! কল্য প্রাতে পুনরায় আপনার গৃহে জ্ঞান-ভিক্ষা করিতে আসিব

পরের দিন প্রাতঃকালে মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডন মিশ্রের গৃহে উভয়-ভারতীর মধ্যস্থতায় এই ঐতিহাসিক জ্ঞান-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ভারতের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষা জ্ঞান-দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত, আর তাহার বিচারক একজন নারী! সাতদিন ধরিয়া এই বিচার-বিতর্ক চলে। অষ্টম দিবসে উভয়-ভারতী দুইজনার বিচার ও সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিলেন যে, যতিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যের উক্তিই যথার্থ।

সভামধ্যে তখন ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের জ্ঞানমহিমা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, হে ভগবন শঙ্কর, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আজ হইতে আমার সকল জ্ঞান-অহংকার আপনার পদে অঞ্জলি দিয়া আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।

বিচারের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উভয়ভারতী বলিলেন, হে যতিশ্রেষ্ঠ, আমাকেও আপনার শিষ্যা করিয়া লউন।

আমি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া এখন মুক্তির জন্য তপঃ নিরত হইতে চাই।

উভয়ভারতীর অপূর্ব্ব জ্ঞান ও প্রতিভা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের বাসনা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, হে কল্যাণী, আপনি স্বয়ং সরস্বতী, সারদা। ভারতের জ্ঞান-মুক্তির জন্য আমি ভারতের নানাস্থানে বহু মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছি তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠই সর্ব্ব-প্রধান আমার বাসনা— আপনি সেই মঠের সমগ্র ভার লইয়া সমস্ত দক্ষিণ-ভারতকে অভিনব প্রজ্ঞায় আলোকিত করিয়া তুলুন। আর আপনার নামানুসারেই আজ হইতে শৃঙ্গেরী মঠ সারদাপীঠ নামে অভিহিত হইবে

# লীলাবতী

বর্ত্তমান যুগে ম্যাদাম কুরী যেমন বৈজ্ঞানিক জগতে নারী হইয়াও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ভারতের গৌরবের যুগে লীলাবতী সেই প্রকার দুরূহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার অসামান্য প্রতিভার প্রতিষ্ঠা করেন।

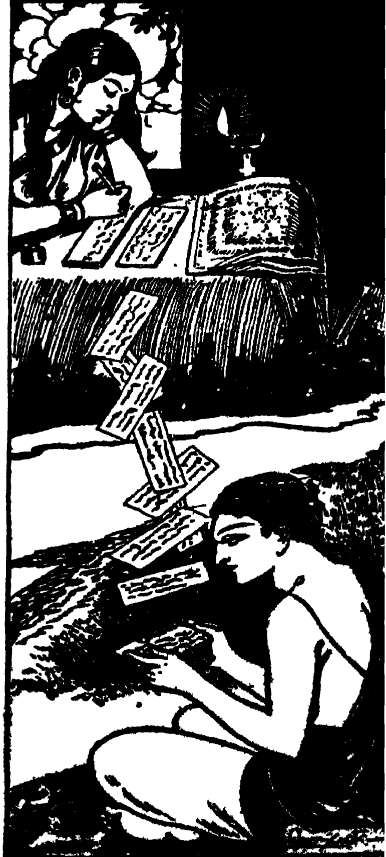
জগতে অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহুস্থলে লীলাবতী পরিচিতা। কিন্তু লীলাবতী ছিলেন ভাস্করাচার্য্যের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। পত্নীর নামকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্য ভাস্করাচার্য্য তাঁহার একটী গ্রন্থকে লীলাবতী নামে অভিহিত করিয়া রাখিয়া যান।



সমগ্র গ্রন্থ প্রশ্ন ও উত্তর ছলে রচিত। ভাস্করাচার্য্য প্রশ্ন করিতেছেন, লীলাবতী উত্তর দিতেছেন। লীলাবতী যে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা হইতেই পারে না, তাহা লীলাবতী গ্রন্থ-পাঠে বোঝা যায়। বহুবার প্রশ্ন করিবার সময় ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কেহ কখনও আপনার কন্যার প্রতি ব্যবহার করে না।

'সখে,' 'বালকুরঙ্গ লোল-নয়নে,' 'মৃগনয়নে, হে কান্তে' বলিয়া বহু শ্লোকে ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের দুহিতা নন—তাঁহার সুযোগ্যা সহ-ধর্ম্মিণী।

# বৈজয়ন্তী দেবী



ষোড়শ শতাব্দীতে এই বাঙ্গালা দেশে এক অসামান্য প্রতিভাশালী নারী কবি জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম বৈজয়ন্তী দেবী। কুমারী অবস্থায় তিনি সংস্কৃত-কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এরূপ অধিকার জন্মায় যে তিনি অবলীলাক্রমে অতি মনোরম শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন।

পদ্মার তীরে ধানুকা গ্রামে বৈজয়ন্তী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার গৃহে নানা দেশ হইতে ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিত। পিতা যখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শিশু-কন্যা তখন তাহা নীরবে শুনিত এবং সেই

শিশুর এতদূর স্মৃতিশক্তি ছিল যে, অনেক সময় অনেক পাঠ তিনি অবিকল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন।

পিতার শিক্ষার ফলে যৌবন-প্রারম্ভেই বৈজয়ন্তী দেবী কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে অসামান্যা বিদুষী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন না বলিয়া উপযুক্ত পাত্রের জন্য পিতাকে ভয়ানক চিন্তিত হইয়া উঠিতে হইল। এতকাল ধরিয়া, এইরূপ শিক্ষা দিয়া যে কন্যাকে লালন-পালন করিয়া তোলা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র বিনা তাহাকে সমর্পণ করা যায় কি উপায়ে?

সেই সময় ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া গ্রামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সংস্কৃত কাব্য-রচনায় সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পুরাতন সংস্কৃত কবিদের মত একান্ত স্বচ্ছন্দ-লীলায় তিনি ছন্দ রচনা করিতেন তাঁহার নাম কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমিক—আনন্দ-লতিকা কাব্যের রচয়িতা।

বহু চেষ্টার পরে কৃষ্ণনাথের সহিত বৈজয়ন্তী দেবীর বিবাহ হইল। কিন্তু এতদিন সংস্কৃত-কাব্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া কৃষ্ণনাথের অন্তরে যে রূপলক্ষ্মীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বৈজয়ন্তী দেবীর আকৃতির কোনও সাদৃশ্য না দেখিয়া তরুণ কবির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বিবাহের পর তিনি পত্নীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসেন এবং তাহার পর তাঁহার সহিত আর দেখাসাক্ষাৎ করেন নাই।

অন্তরের প্রেম-ভার অন্তরে লইয়া একান্ত উদাসীন ভাবে বহুবৎসর পতি-বিরহে বৈজয়ন্তী দেবীর এমনি কাটিয়া যায়। এতদিন ধরিয়া অন্তরে তিল তিল করিয়া যে মধু সঞ্চিত হইল, কেহ তাহার খবর লইল না। যে আসিল বাহিরের আবরণ দেখিয়া সেও ফিরিয়া গেল!

আপনার মনে বৈজয়ন্তী দেবী শ্লোক রচনা করেন। একদিন তিনি

স্থির করিলেন যে, স্বামীকে একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি এই ক্ষুদ্র শ্লোকটী স্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে ॥

বৈজয়ন্তী দেবী যে সংস্কৃত সাহিত্যে কতখানি পারদর্শী ও রসিক ছিলেন, এই সামান্য শ্লোকটীই তাহার প্রমাণ। সহজ শব্দ-বিন্যাস এবং অনুপ্রাসের লালিত্যের অন্তরালে অল্প কথায় অন্তরের নিগূঢ় বাসনা এইরূপ রহস্যচ্ছলে ব্যক্ত করা সহজ-সাধ্য নয়। শ্লোকটীর অর্থ হইতেছে,—

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সারারাত্রি মশকগণ আমার অঙ্গে ব্যথা দিতেছে। তাহারা ধূম অথবা ব্যজন কিছুরই বাধা মানে না।

অর্থাৎ তোমার বিরহে আমার নিশীথের নিদ্রা চলিয়া গিয়াছে। মশকরা আমার অঙ্গে আঘাত করিতেছে, তুমি না হইলে কে আমাকে রক্ষা করিবে?

কৃষ্ণনাথের কবি-হৃদয় পত্নীর কবি অন্তরের পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল এবং তিনি তাহার উত্তরে এতদিনের উপেক্ষিতা পত্নীকে প্রেমসম্ভাষণে পত্র লিখিলেন। স্বামীর পত্র পাইয়া বৈজয়ন্তী দেবী পুনরায় আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন,—

পুন্নাগচম্পকলবঙ্গসরোজমল্লি
মাতঙ্গযূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দকুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ত্ব মেতৎ ॥

অভিমানী নারীর অন্তর বলিয়া উঠিল, হে মধুকর তোমার ব্রত হইতেছে নাগকেশর, চম্পক, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, যূথী যাতির সুরভি-সুরস মধুপান

করা। আজ যে সেই সব পুষ্পের সুরভি ত্যাগ করিয়া এই সামান্য কুন্দ কুসুমের মধুপানে অভিলাষী হইয়াছ, ইহাতে তোমারই সদ্বংশের এবং মহৎ হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে

কৃষ্ণনাথ বৈজয়ন্তীর অন্তরের পরিচয় পাইয়া লিখিলেন,

যামিনীবিরহদূন মানসঃ
ত্যক্তকুট্‌মালিত ভূরিভুরহ।
বিন্দুবিন্দুমকরন্দলোলুপঃ
পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে॥

কৃষ্ণনাথ লিখিলেন, হে আমার পদ্মিনী, সূর্য্যোদয়ে তুমি বিকশিত হইয়া পুনরায় সূর্য্যাস্তে যখন মুদিত হইয়া আস, জানি সমস্ত রাত্রি তোমার বিরহে কাটে কিন্তু ভ্রমরেরও মধুপানে ব্যাঘাত হয়। সে জাগিয়া থাকে কখন আবার সূর্য্যোদয় হইবে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে পদ্মিনীর দিকেই ধাবিত হয়।

বৈজয়ন্তী দেবীরও ভাগ্য-শতদল এতদিনে ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দে তাঁহারা দুইজনে কাব্যশাস্ত্রালোচনায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আনন্দলতিকা কাব্যের বহু শ্লোক বৈজয়ন্তী দেবীর রচিত।

# প্রিয়ম্বদা

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে যে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাশালিনী রমণী জন্মগ্রহণ করেন, প্রিয়ম্বদা তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় তিনশো বছর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে প্রিয়ম্বদা এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবরাম সার্ব্বভৌম।

সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে তিনি প্রথমে উদাসীন ছিলেন ; তাঁহার ধারণা ছিল যে শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা গভীর জ্ঞানান্বেষণে নারীর অধিকার বা প্রয়োজনীয়তা নাই। শিশুকন্যা পিতার টোলে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, দুরূহ সংস্কৃত শ্লোক শুনিত এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপাব রাত্রিকালে আপনার মনে দিনের বেলায় শ্রুত সেই সমস্ত সংস্কৃত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে উচ্চারণ করিত। সার্ব্বভৌম মহাশয় কন্যার মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার ধারণার ভ্রান্তি বুঝিয়া কন্যাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।



সাধারণ ছাত্রদের সহিত প্রিয়ম্বদা পিতার টোলে

অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি পিতার সহিত সংস্কৃতে কথোপকথন করিতে শিখিলেন। শুদ্ধ সংস্কৃতে তিনি অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারিতেন— সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহার এমনি আধিপত্য জন্মাইল। সেই কিশোরী একে একে কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিলেন। প্রিয়ম্বদার আর একটী স্বভাবজ গুণ ছিল। তিনি স্বর-তান-লয় সমেত অতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। প্রিয়ম্বদা অবলীলাক্রমে সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতেও পারিতেন এবং তাঁহার অনেক শ্লোক এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রিয়ম্বদার যতই বয়স হইতে লাগিল ততই তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল যে, তিনি মীমাংসা-শাস্ত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিবেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তখন কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও মনের মতন পাত্রের সন্ধান মিলিল না। অবশেষে সার্ব্বভৌম মহাশয় স্থির করিলেন যে তিনি প্রিয়ম্বদাকে লইয়া কাশী যাইবেন। সেইখানে কন্যার অধ্যয়নও হইবে এবং তিনিও একটী সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিবেন।

কাশীতে পিতা ও কন্যা এক মঠে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইখানে প্রিয়ম্বদা শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মনের শান্তি নাই। তিনি কন্যার জন্য একটী উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় একদিন সেই মঠে এক অপরূপ-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-কুমার বিদ্যার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাবয়ব হইতে জ্ঞানের এক বিমল জ্যোতি বাহির হইতেছে। সার্ব্বভৌম মহাশয় পরিচয় পাইলেন, যুবকের নাম রঘুনাথ মিশ্র, কনৌজী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা একজন বিখ্যাত জমিদার, কিন্তু তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে জীবন

অতিবাহিত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। কনৌজী ব্রাহ্মণ শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় অন্তরে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু এরূপ বিদ্বান্ ও সুন্দর পাত্র আর কোথাও মিলিবে না তাহাও বুঝিলেন। রঘুনাথও প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় অন্তরে বিবেচনা করিয়া রঘুনাথের নিকট কন্যার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রঘুনাথ আনন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, প্রিয়ম্বদাও এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

যথাকালে রঘুনাথের পিতার অনুমতি লইয়া রঘুনাথ ও প্রিয়ম্বদার বিবাহ হইয়া গেল। রঘুনাথের পিতা সন্তুষ্ট হইয়া একটী সমগ্র গ্রাম পুত্র ও পুত্রবধুকে যৌতুক-স্বরূপ দিতে চাহিলেন। কিন্তু নব-দম্পতী সে দান গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "এত বড় ভূসম্পত্তি লইয়া আমরা কি করিব? ভূ-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেই যদি দিন চলিয়া যায়, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিব কবে? শুধু ভোজন ও আচ্ছাদানের উপযুক্ত সামান্য আয় হইলেই আমাদের চলিয়া যাইবে।" রঘুনাথ ও প্রিয়ম্বদা সে দান গ্রহণ করিলেন না। সামান্য ভূমি লইয়া তাঁহারা দুইজনে শাস্ত্রালোচনা ও দেবার্চ্চনায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গৃহকার্য্য সমস্তই প্রিয়ম্বদা স্বহস্তে করিতেন—কোনও দাসদাসী রাখেন নাই। কথিত আছে, প্রত্যহ পূজার জন্য তিনি একটী করিয়া নূতন স্তব রচনা করিতেন। প্রিয়ম্বদা অবশিষ্ট-জীবন গভীর শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। তিনি বহু দুরূহ সংস্কৃত পুস্তকের টীকা রচনা করেন। প্রিয়ম্বদা অন্যান্য টীকার মধ্যে মদালসা-উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মের একখানি সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

# মীরাবাঈ

"মরমিয়া সাধকরা মীরার জীবনকে একটী সঙ্গীতের মতই মনে করেন। দেহতত্ত্ববাদী সাধক যেমন সাধন-ধারায় দেহস্থিত ষটচক্র-'বেধ' করিয়া ব্রহ্মকমলরস পান করেন, মীরাও তেমনি তাঁর জীবনধারা দ্বারা ছয়টী সঙ্গীতময় অবস্থাকে পার হইয়া ভবানন্দরসে ভরপূর হইয়া গিয়াছেন।"

মারবার প্রদেশের মোরতা গ্রামের সামন্ত রতিয়া রাণার ঘরে মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। মীরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার নিকট হইতে দুইটী মহামূল্য সম্পদ্ লইয়া আসিয়াছিলেন—একটী তাঁহার অপরূপ রূপ এবং অপরটী মানবচিত্তমোহিনী সুকণ্ঠ। যে দেবতা মীরাকে মানবীরূপে এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, হয়ত তিনি এই প্রবাসী দেব-দুহিতার সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই বাল্যে মীরার অশিক্ষিত কণ্ঠে অপূর্ব্ব রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত—যে-বালিকার চিত্ত খেলাঘরের সীমানা অতিক্রম করে নাই, তাহারই কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, পরম-দেবতার আহ্বান-রাগিণী।

ভগবৎ-ভাবাবেশে বিহ্বল এই রাজকন্যার কথা ক্রমে মোরতা গ্রামের ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়াইয়া মারবার প্রদেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। বালিকা মীরার সঙ্গীত শুনিবার জন্য দূর-দুরান্তর হইতে লোকে মোরতা-গ্রামে রতিয়া রাণার অতিথি হয়।

মীরার এই অপরূপ খ্যাতির কথা ক্রমশঃ চিতোরে আসিয়া পৌছিল। চিতোরের রাণা মোকালদেবের পুত্র যুবরাজ কুম্ভ মীরার কথা শুনিয়া তাহার দর্শনাভিলাষী হইলেন। কথিত আছে যে, যুবরাজ কুম্ভ ছদ্মবেশে একদিন অধীন সামন্ত রতিয়া রাণার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য

সকলের ন্যায় মীরার সঙ্গীত-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। মীরার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার অপরূপ রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যুবরাজ কুম্ভ বিদায়ের কালে রতিয়া রাণার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। সামন্ত রতিয়া রাণা স্বয়ং যুবরাজের এই প্রস্তাবে আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দসঙ্গীত-বিহারিণী মীরা চিতোরের রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বন্দিনী হইলেন।



রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য-বিলাস মীরার অন্তরে আনন্দ আনিয়া দেয় না। ঐশ্বর্য্যের ও বন্ধনের পর্ব্বত-গাত্রে তাঁহার অন্তরের ভাব-তরঙ্গ প্রতি-মুহূর্ত্তে বাধা পায়। তাঁহার অন্তরের উদাসিনী নারী সঙ্গীতে সঙ্গীতে পরম দেবতার

যে বেদী রচনা করিতেছিল, মীরা দেখিলেন যে তাহার চারিদিকে অন্য কাহারা ভিড় করিয়া আসিতেছে—অন্তরের অনাত্মীয় তাহারা। তাঁহার দেবতা ও তাঁহার মধ্যখানে সংসারের বন্ধনের এবং দায়িত্বের শত বাধা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। স্বামীর সংসার, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত স্নেহ, সামাজিক ও পারিবারিক শত বিধি-নিষেধ তাঁহার অন্তরের বিকাশকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিতে চায়।

মীরার বাসনা অনুযায়ী চিতোর-প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁহার উপাস্য দেবতা রণছোড় বালগোপালের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মীরা নিত্য নূতন ছন্দে, নিত্য নূতন মন্ত্রে প্রাণের শ্যামল দেবতার নাম-সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্কার-বিমুক্ত চিত্ত কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সমগ্র নিখিল জুড়িয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন—অহরহঃ আকাশে, বাতাসে, আলোকে, অন্ধকারে যাঁহার আহ্বান ধ্বনিয়া উঠিতেছে, মুক্ত-প্রাণের-ক্ষেত্রে আসিয়া সব বন্ধন, সব লজ্জা মুক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিবার জন্য, ঐশ্বর্য্যের বাধায়-ঘেরা ক্ষুদ্র-বন্ধনীর মধ্যে কেমন করিয়া সে আহ্বান শুনিয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায়?

সমুদ্রের আহ্বানে নদী যেমন করিয়া আত্ম-সমর্পণের উন্মাদনায় বাহির হইয়া পড়ে, পরম-দেবতার আহ্বানে উদাসিনী মীরা তেমনি একদিন রাজপ্রাসাদ, রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া মীরা অন্তরের দেবতার অভিসারে যাত্রা করিলেন—সঙ্গীতে দেবতার অপূর্ব্ব ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিয়া উঠিল।

চিতোরের রাজপথ দিয়া, উত্তর ভারতের গিরি-নদীর ধার দিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর একদিন এক ভাব-বিহ্বলা নারী পথে পথে সঙ্গীতের যে অপূর্ব্ব কুসুম ছড়াইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হন, তাহার সুরভি আজও তেমনি বিরহী-চিত্তকে সুবাসে ভরিয়া দিতেছে—সেদিনের বৃন্দাবন-পথ-

যাত্রী ব্যাকুলা নারীর সঙ্গীত-অভিসারে রস-পিপাসী নিখিল বিরহী হিয়ার যে আকুল ক্রন্দন রণিয়া উঠে, আজ তাহা চন্দ্রসূর্য্য উদয়ের ছন্দের সহিত গাঁথা হইয়া গিয়াছে। মীরার সঙ্গীত আজ বিশ্ববাসী মরমিয়া চিত্তের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। জগতের যে কোনও সাহিত্যে ইহা দুর্লভ।

মীরার বাহিরের জীবন ও তাঁহার অন্তরের বাসনা এক হইয়া তাঁহার সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে। তাই তাঁহার রচিত সঙ্গীতের মধ্যেই তাঁহার জীবনের অথবা ভাব-জীবনের সমস্ত রূপ বিকশিত দেখা যায়। যোগই যেমন যোগীর জীবন, তেমনি মীরার সঙ্গীতগুলিই মীরার জীবন।

"মীরার রচিত অনেক গান বিদ্যমান, তার ভাষা ও সুর অতি চমৎকার। কিন্তু তন্মধ্যে মীরার ছয়টী গানে যেন তাঁহার জীবনের সব গভীর ভাবই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার বাহিরে তাঁহার যে জীবন তাহা যেন অতিরিক্ত ঘটনা মাত্র। আসল সব কথাই আসিয়া পড়িয়াছে এই ছয়টী গানের মধ্যে। এই ছয়টী গানে যেন ছয়টী ভাবের চক্র-'বেধ' করিয়া মীরার সঙ্গীতময় জীবন-ধারা যোগানন্দরসে ভাবলোকে আপন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বন্দিনী নারী সহসা আপনার অন্তরের নিঃশব্দতার মধ্যে শোনে যে, পরম-দেবতা আহ্বান করিতেছে। সে আহ্বান যেন বলিতেছে, পরম-ক্ষণ বহিয়া যায়, এখনও কেন মিথ্যা মায়া লইয়া বসিয়া আছ? মীরার অন্তর গাহিয়া উঠে—

নৈন ললচাব্‌ত জীয়রা উদাসী।
সাঁব্‌ল বনমেঁ বাজে সাব্‌লকী বাঁসী।
রৈণ মেঁ সৈন মেঁ মোরা নৈনা না লাগে।
পীতমকে খাল আবে্‌ কুঞ্জমঞ্জুবাসী।

“আজ আমার নয়ন প্রলুব্ধ, জীবন উদাসী। ( নিশিদিন শুনিতেছি ) শ্যামল বনের মধ্যে আমার ( চির ) শ্যামলের বাঁশী বাজিতেছে। রাত্রির সুখ-শয়নে নয়নে আমার নিদ্রা নাই। ( এই নিশীথের অন্ধকারে বাতাসে বাতাসে আমি স্পর্শ করিতেছি ) প্রিয়তমের কুসুম-সুবাসী দীর্ঘ-শ্বাস আসিতেছে।”

চরাচরবিহারী প্রিয়তম আমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—মহাকালের হৃদয় হইতে আমারই সঙ্গসুধা-অভাবের জন্য কুসুমসুবাসী দীর্ঘ-শ্বাস আসিতেছে। বিশ্বপতির মিলন-লগ্ন আমার জন্য উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি কেন ঘরে বসিয়া থাকিব?—মীরার অন্তর প্রিয়তমের আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিল। মীরা গৃহত্যাগিনী হইলেন। কিন্তু কোথায় প্রিয়তম? যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলাম, যাহার সহিত মিলিব বলিয়া বিশ্বকে পিছনে রাখিয়া আসিলাম, কোথায় সে শ্যামল বংশীধারী? আহ্বান করিয়া একি বিরহ-বঞ্চনা! মীরার অন্তর গাহিয়া উঠিল,

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা।
অব মোহি কূঁ্য তরসাবো॥
অব ছোড়ঁ্যা নহি বনৈ প্রভুজী।
চরণধেঁ পাস বুলাবো॥
বিরহবিথা লাগী উঁর অংদর।
(প্রভুজী) সো তুম আয় বুঝাবো।
মীরা দাসী জনম জনমকী
মম অঙ্গসুঁ অঙ্গ লাগাও।
(প্রভুজী) মম চিত্তসুঁ চিত্ত লাগাও॥

"তোমারই কারণ সব সুখ ত্যাগ করিলাম—তবুও কেন আর আমাকে তৃষিত রাখো? (জীবনে এমন কোনও সুখ নাই, অন্তরে এমন কোনও বাসনা নাই, যাহা তোমার মিলন-আকাঙ্ক্ষায় বিসর্জ্জন দিই নাই) এখন আমাকে ছাড়িয়া দূরে থাকা আর তোমার সাজে না। হে আমার প্রভু! তোমার শ্রীচরণপাশে আমাকে ডাকিয়া লও। তোমার বিরহ আমার অন্তরের ভিতরে আসিয়া আঘাত করিতেছে। মীরা যে তোমার জনম-জনমের দাসী, তাহার মর্ম্মের এই ব্যথা তুমি আসিয়া দূর কর। তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গে আসিয়া লাগুক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে স্পর্শ করুক, হে আমার প্রভু!"

মীরার এই সঙ্গীতে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অকুণ্ঠ-বাণী জাগিয়া উঠিয়াছে; লজ্জা নাই, সজ্জা নাই, আয়োজন নাই, আড়ম্বর নাই, ভয় নাই, দ্বিধা নাই, প্রিয়তম ও তাহার মধ্যে মিলন-আকুল কম্পমান অন্তর ব্যতীত আর কিছু নাই। এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া প্রেম আপনার মধ্যে আপনি সার্থক হইয়া উঠে। অন্তরের হৃদ্‌স্পন্দনে যেন প্রিয়তমের পদধ্বনি বাজিয়া উঠে। প্রতি মুহূর্ত্ত তখন প্রিয়তমের আগমন-লগ্নকে আগাইয়া আনে। আলো ও ছায়ার খেলায় তাঁহারই রূপের আভাস ফুটিয়া উঠে। প্রত্যেক জিনিষই যেন অগ্রদূত হইয়া তাঁহারই আগমনবার্ত্তাকে ঘোষণা করে। মীরা গাহিলেন,—

সুনী মৈঁ হরি আবনকী আবয়াজ।
মহল চড়ি চড়ি জোঁউ মোরী সজনী
কব্ আবৈ মহারাজ।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ
কোইল মধুরে সাজ।

গরজে বদররা মেঘা বৌলে
দামিন ছোড়ী লাজ।
ধরতী রূপ নবা নবা ধরিয়া
কংত মিলনকে কাজ।
মীরাকী চিত ধীরা ন মানৈ
বেগ মিলো মহারাজ।"

"আমার হরির আগমন-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ( কিন্তু তাঁহাকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। সকল ঐশ্বর্য্য, সকল বাধার ঊর্দ্ধে আজ তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি ) তাই, ওলো সখী, ঐশ্বর্য্যের রাজ-প্রাসাদের ঊর্দ্ধে চড়িয়া আজ সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখিতেছি, কোথায় আমার অন্তরের স্বামী! ( প্রকৃতিও আজ আমার অন্তরের সহিত মিশিয়া সেই আগমন-লগ্নের জন্য উৎসুক হইয়া আছে।) তুমি আসিবে বলিয়া দাদুর, ময়ূর, পাপিয়া গান গাহিতেছে। কোকিল তান ধরিয়াছে। আকাশ হইতে মেঘের গর্জ্জনে বাদল নামিয়া আসিতেছে, লজ্জার আবরণ ছিন্ন করিয়া মেঘ-মুক্তা বিদ্যুৎলতা প্রকাশ পাইতেছে; ধরণীও আজ কান্ত-মিলনের জন্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া আছে। হে স্বামি, মীরার চিত্ত যে আর ধৈর্য্য মানে না, তাহাকে দেখা দাও।"

এত আকুলতা, তবু তুমি এলে কৈ! অাদি প্রিয়তমের লগ্ন উত্তীর্ণ হয় না, তিনি যখনই আসিবেন, তখনই শুভ-লগ্ন, কিন্তু মর্ত্ত্যমানবের লগ্ন যে সীমাবদ্ধ! তাই বিরহ ব্যাকুলতর হইয়া উঠে। প্রিয়তম-হীন প্রতি মুহূর্ত্ত জীবনের চারিদিকে মৃত্যু-আঁধার আনিয়া দেয়। মীরার দেহ-মন প্রদীপ শিখার মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া ক্ষয় হইয়া যায়—আর মীরা গায়—

চিতনন্দন বিলমাঈ
বাদরা না ঘেরী মাঈ।
ইতঘন গরজে উতঘন লরজে
চমকত বিজ্জু সবাঈ।
উমঁড় ঘুমঁড় চাহুঁ দিস সে আয়া
পবন চলে পুরবাঈ।
বিরহন্ন মেরো প্রাণ জ্বলত হৈ
দগধ বেলী সিঁচাঈ।
প্রাণ রহ্‌ত মেকো দরসন দীজ্যো
প্রাণ রখৌ চরণাঈ।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ
কোয়েল সব্দ স্তুনাঈ।
মীরাদাসী চরণ উপদাসী
চরণকমল চিতলাঈ।

"হে চিতনন্দন, বড় বিলম্ব হইতেছে ( তোমার আগমনের )। এধারে আমার চারিদিকে বাদল ছাইয়া আসিতেছে। এধারে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ওধারে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। নানাদিক হইতে আসিয়া ( জীবন-আকাশে ) ঘন-মেঘ জমাট বাঁধিতেছে। অশান্ত পুরবীয়া বায়ু বহিতেছে ( অন্তরে তার অশ্রুজলভার )। বিরহের দহনে প্রাণ জলিয়া যাইতেছে। দগ্ধ-লতাকে তোমার জল-সিঞ্চনে প্রাণ দাও। প্রাণ থাকিতে আমাকে দরশন দাও, তোমার চরণ-প্রান্তে আমাকে রাখ। দাদুর, ময়ুর, পাপিয়া ডাকিতেছে, কোকিল তান ধরিয়াছে। মীরা তোমার চরণ-উপাসী দাসী, তোমার চরণ-কমলে আজ তাহার চিত্তকে তুলিয়া লও।"

গভীর বিরহের মধ্যে কখন প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। নিঃশেষিত ধ্যানের মধ্যেই প্রিয়তম আসিয়া ধরা দেন। বাহিরের দূরত্বের যবনিকা সরাইয়া প্রিয়তম তখন অন্তরে আসিয়া বিরাজ করেন। অশান্ত চিত্ত তখন শান্ত হইয়া উঠে। অন্তর-বাহির উজল করিয়া প্রেমিকের প্রেম-উপলব্ধির মধ্যে তিনি বিরাজ করেন। মীরা প্রেমের একনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার মধ্যে প্রিয়তমের দেখা পাইলেন। জীবন-কমল সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আর তো কোনও কামনা নাই, আর তো কোনও লোভ নাই—তাঁহার আলোকে এই যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছি এই তো চরম সার্থকতা—ইহারই মধ্যে তো সৃষ্টির সমস্ত আনন্দ লুক্কায়িত। আজ তাই চিত্ত প্রসন্ন। কোনও তাড়াহুড়া নাই, কোনও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নাই—বিশ্ববিহীন বিজনতার মধ্যে ধ্যানের নিশীথলোকে যেথান দিয়া অনাদিকালের প্রেম-নদী নিঃশব্দ ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, তাহার তীরে মীরার প্রিয়তম মীরাকে দর্শন দিয়াছেন, তাই মীরা গাহিতেছেন,—

"ম্হানে চাকর রাখো জী
চাকর রহস্যুঁ বাগ লগাস্যুঁ
নিত উঠি দরসন পাস্যুঁ।
বৃন্দাব্নকী কুংজ গলিন্মেঁ
তেরী লীলা গাস্য।
হৃয়ে হরে সব বন বনাউঁ
বিচ বিচ রাখুঁ বারী।
সাঁবলিয়াকে দরশন পাউঁ
পহির কুসুম্মী সারী।

জোগী আয়া জোগ করণ কুঁ
তপ করণে সন্ন্যাসী।
হরী ভজনকুঁ সাধু আয়ে
বৃন্দাবনকে বাসী।
মীরাকে প্রভু গহির গঁভীরা
হৃদয়ে রহোজী ধীরা
আধীরাত প্রভু দরসন দেহৈঁ
প্রেমনদীকে তীরা ॥"

"হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে তোমার বৃন্দাবনের পুষ্প-কাননে চাকর রাখো গো! তোমার চাকর হইব, তোমার পুষ্পোদ্যান রচনা করিব। (শুধু এই মাত্র আশা) নিত্য প্রভাতে উঠিয়া তোমার দর্শন পাইব!

বৃন্দাবনের কুঞ্জগলিতে তোমারই লীলা গাহিয়া বেড়াইব।

চারিদিকে আমি শ্যামলের সৃষ্টি করিব—তাহারই মাঝে মাঝে কুসুম হাসিয়া উঠিবে। এ অভিনব শ্যাম-সৃষ্টির মধ্যে সকল কুসুম-শোভায় আমার চিরশ্যামলের দর্শন পাইব।

যোগী আসিয়াছেন যোগ-সাধনের জন্য, তপস্যার জন্য আসিয়াছেন সন্ন্যাসী, সাধু আসিয়াছেন হরিভজনের জন্য—সবাই বৃন্দাবনবাসী। (সবারই এক নির্দিষ্ট স্থান কাল উদ্দেশ্য আছে) মীরার যে প্রভুর সঙ্গে গভীর গম্ভীর প্রেমের সম্বন্ধ। তাই ওরে অবুঝ হৃদয়, তুই শান্ত হ' (বাহিরে কোথায় তাঁহাকে পাইবি?) নিশীথ-রাত্রে প্রভু যে তোকে দর্শন দিবেন প্রেম-নদীর তীরে।"

ধ্যানের নিশীথ-রাত্রে প্রেম-নদীর তীরে মীরা তাঁহার প্রিয়তমের দেখা পাইয়াছেন। "মীরা দিনের পর দিন আপনাকে তাঁর প্রিয়তমের

মধ্যে বিলীন করিয়া দিতেছেন। ক্রমে তাঁর জীবন প্রেমে প্রেমময় হইয়া প্রিয়তমময় হইয়া উঠিতেছে। তখন তিনি তাঁর আগেকার রচিত একটী গানে জীবনের সুরটী বাঁধিয়া সেই গানেই তাঁর মর্ম্মের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বলিলেন,"—

ম্হারে জনম মরণকে সাথী।
থানে নহিঁ বিসরূঁ দিনরাতী।
তুম দেখ্যাঁ বিন কলন পড়ত হৈ
জানত মেরী ছাতী॥
ঊঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূ
রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী॥
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর
হরি চরণাঁ চিতরাতী।
পল পল তোরা রূপ নিহারূঁ
নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

"জনম, মরণে হে সাথী, তোমাকে যেন দিন-রজনী ক্ষণিকের তরেও না ভুলি। তোমাকে না দেখিলে হৃদয় যে কি কাতর হইয়া উঠে, হৃদয়ই তাহা জানে। (সকল বাধার) ঊর্দ্ধে উঠিয়া তোমার আগমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকি, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রক্তিম হইয়া উঠে। হে মীরার প্রভু পরম-মনোহর, হে হরি, মীরার অন্তর তোমারই চিত্ত-অনুরাগী। আমি পলে পলে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি, নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছি।"

মীরার এই সঙ্গীততপঃ-সাধনা ভারতের ভাব-ধারার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অবদান।

# জেবন্নেসা

চিরকুমারী পূত-চরিত্রা জেবন্নেসা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রথম সন্তান এবং মোগল-হারেমের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। মাতার নাম দেলরসবানু বেগম।

বাল্যে ও কৈশোরে জেবন্নেসা গভীর পাঠানুরাগের পরিচয় দেন এবং যৌবন-প্রারম্ভেই তিনি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। সাহিত্য ও কাব্যের অনুশীলনে এবং অন্তরের সহজ প্রেরণায় জেবন্নেসা কিশোর কাল হইতেই কাব্য রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতা ফার্সী সাহিত্যে একটী বিশেষ সম্পদ্।

ঔরঙ্গজেব যখন সম্রাট হইলেন তখন কন্যার জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুশীলন দেখিয়া তিনি যাহাতে



জেবন্নেসা নিরঙ্কুশভাবে সেই জীবন-যাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য চারিলক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি এবং পাঠাগার ও সাহিত্যরচনা প্রভৃতির সুবিধার জন্য বিভিন্ন বাস-ভবন তৈয়ারী করাইয়া দিলেন।

জেবন্নেসা ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি, তাহার উপর মোগল-রাজকুমারী হইয়া তিনি ছিলেন চির-কুমারী। সেই জন্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা ও উর্দ্দু সাহিত্যে সত্যমিথ্যা-বিজড়িত বহু উপন্যাস ও আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও আখ্যানে বলা হইয়াছে যে, জেবন্নেসা শিবাজীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া গোপনে শিবাজীকে ভালবাসিতেন; কাহারও মতে ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শেকোর জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমানের সহিত জেবন্নেসার বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কিন্তু সোলেমান ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া বন্দী অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। এই শোকে ও ক্ষোভে জেবন্নেসা বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও কাব্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেন। এই প্রকারে সেই সময়কার বহু ব্যক্তির নামের সহিত বিজড়িত হইয়া জেবন্নেসা উপন্যাসের পাতায় নানারূপে বিরাজ করিতেছেন।

অনেকের সিদ্ধান্ত যে যৌবনে জেবন্নেসা সুফীধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। সুফী মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ অনুযায়ী একমাত্র পরমেশ্বরকে অন্তরের প্রিয়তম ভাবিয়া তাঁহারই নিকট জেবন্নেসা আত্ম-সমর্পণ করেন। তাঁহার সমস্ত কবিতা সেই আত্মসমর্পণের সুরে বাঁধা।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কথিত আছে যে সম্রাট স্বীয় কন্যাকে সেই বিপ্লবে সম্পৃক্ত মনে করিয়া অবশিষ্ট জীবন অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

আপনার অন্তরের নিরুদ্ধ সহস্র বাসনা লইয়া চিরকুমারী জেবন্নেসার জীবন তাই রুদ্ধ-কোরক-ভ্রমরের ব্যথা-গুঞ্জনের মত মোগল-সাম্রাজ্যের মহাড়ম্বরের ঐক্যতানের অবসানে আর এক বিষণ্ণ সুর আনিয়া দেয়।

# রাণী দুর্গাবতী

মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ। আকবর শাহ্ তখন দিল্লীর সিংহাসনে। সেই সময়কার কথা।

রোটা ও মহোবার অধিপতি চান্দেল বংশীয় রাজা শালিবাহন দুহিতা দুর্গাবতীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। অসামান্যা সুন্দরী কন্যা। যৌবনারম্ভেই পুরুষ-সুলভ সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে। যুদ্ধ-বিদ্যা ও মৃগয়ায় তাহার সমকক্ষ রোটা ও মহোবার মধ্যে আর কেহ নাই। কিন্তু তাহার উপযুক্ত পাত্র কোথায় ?

দুর্গাবতীর রূপ ও গুণের সৌরভ রোটা ও মহোবার সীমা অতিক্রম করিয়া গড়মণ্ডলের বীর রাজা দলপতি সাহের কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। দলপতি সাহের বীরত্বের ও পৌরুষের কথা গড়মণ্ডল অতিক্রম করিয়া রোটা ও মহোবার অধিপতির কন্যার নিকটও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

দলপতি সাহ্ শালিবাহনের নিকট তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নীচবংশের বলিয়া শালিবাহন দলপতি সাহের আবেদন ঘৃণায় অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে কন্যা দুর্গাবতী আপনার মনে দলপতি সাহকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া লইল।

বীর নারী বীরকে পূজা করে।

দলপতি সাহ ঘোষণা করিলেন, তিনি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করিয়া তিনি

কন্যাকে জয় করিয়া আনিবেন। রাজা শালিবাহন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুর্গাবতী অন্তরে আনন্দিত হইলেন

দলপতি সাহের বিক্রমের কথা শালিবাহনও জানিতেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তিনি কন্যার বিবাহে সম্মত হইলেন।

যথাকালে গড়মণ্ডলের রাণী হইয়া দুর্গাবতী স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু দৈব বিরূপ হইল। অল্পকাল যাইতে না যাইতে দলপতি সাহ পরলোক গমন করিলেন। বিধবা রাণী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের সিংহাসনে বসিয়া প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন।

নারীকে সিংহাসনে দেখিয়া আশে-পাশের বহু রাজা গড়মণ্ডল গ্রাস করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বহু রাজা পরাজিত হইয়া বুঝিল, এইরূপ নারী যুগে যুগে জন্মায় না।

গড়মণ্ডলের পার্শ্বে পান্না রাজ্য। আকবর শাহের সেনাপতি আসফ খাঁ সেই রাজ্য জয় করিয়া তাহা শাসন করিতে থাকেন। গড়-মণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া গড়মণ্ডলকে গ্রাস করিবার তাঁহার লোভ হইল। বণিকের বেশে গুপ্তচর পাঠাইয়া তিনি গড়মণ্ডলের গুপ্ত স্থানের সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং দিল্লীতে গড়মণ্ডলের শাসনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা-উক্তি করিয়া সৈন্যের সাহায্যের জন্য পত্র লিখিলেন। আকবর শাহ সৈন্য পাঠাইতে চাহেন নাই, কিন্তু আসফ খাঁর পুনঃপুন অনুরোধে অবশেষে তিনি সৈন্য পাঠাইলেন।

রাণী দুর্গাবতী সবিস্ময়ে শুনিলেন যে, পর্ব্বতপ্রমাণ মোগল-সৈন্য তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

বীর নারী ভীত হইলেন না। আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া আপনি সেনাপতি হইয়া আসফ খাঁর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধে আসফ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

দিল্লীতে এই পরাজয়ের সংবাদ গিয়া পৌছিল। রাজদরবারে বসিয়া দিল্লীর সম্রাট শুনিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত সৈন্য ও তাঁহারই সেনাপতি গড়মণ্ডলের এক-জন বিধবা নারীর শক্তিতে পরাজিত হইয়াছে। দিল্লীর রাজদরবারে আকবর শাহ রাণী দুর্গাবতীর অসীম বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন।



পরাজিত আসফ খাঁ পুনরাক্রমণের জন্য অধিকতর সৈন্যের আবেদন করিয়া দিল্লীতে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পরাজয়ের গ্লানি বিমোচনের জন্য দিল্লী হইতে চতুর্গুণ অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরিত হইল। আসফ খাঁ দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন।

কুমার বীরনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতিরূপে পুনরায় রাণী দুর্গাবতী সমরে অবতীর্ণ হইলেন।

বিপুল মোগল-সৈন্যের সহিত দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রাণী দুর্গাবতী পণ করিলেন, গড়মণ্ডলে একটী প্রাণী থাকিতেও মোগল যেন গড়মণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারে না।

যুদ্ধের মধ্যখানে কিশোর কুমার সহসা বাণবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। সেই খানেই পুত্রকে রাখিয়া রাণী দুর্গাবতী শত্রু-নিধনে গভীরভাবে সংগ্রামে প্রবেশ করিলেন। সহসা একটা বাণ আসিয়া তাঁহার গলায় লাগিল। হাত দিয়া বাণ উপড়াইয়া ফেলিয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রুধিরে সর্ব্বাঙ্গ লাল হইয়া উঠিল। রক্ত-পাতে শরীর যখন অবসন্ন হইয়া আসিল তখন দুর্গাবতী বুঝিলেন, বাঁচিবার আর উপায় নাই, মৃত্যু সন্নিকট, মোগল আসিয়া সাধের গড়মণ্ডল অধিকার করিয়া লইবে। মন্ত্রী অধরকে পার্শ্বে ডাকিয়া তাহার হস্তে তরবারি দিয়া বলিলেন, মোগল-বিজয়ের পূর্ব্বে এই দেহ তুমি বিনষ্ট করিয়া দাও— যাহাতে শত্রু আমাকে জীবিত অবস্থায় পরাজিত না দেখিতে পায়। এই ভয়াবহ কার্য্য করিতে মন্ত্রী অধর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন রাণী দুর্গাবতী স্বহস্তে তরবারি লইয়া নিজ মুণ্ড ছেদন করিলেন।

বীর নারীর রক্তের স্পর্শে ধরণীর ধূলি মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। সেই রক্ত-তর্পণ ভারতের ইতিহাসকে এক অপূর্ব্ব স্মৃতির রক্ত-রাগে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

# অহল্যাবাঈ

মালবদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া মহারাষ্ট্র-অধিপতি বাজীরাও পেশোয়াবের সেনাপতি, ইন্দোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মল্‌হররাও হোলকর পুণায় ফিরিতেছিলেন। পথে পাথরডী নামক এক গ্রামে বিশ্রামের জন্য তিনি সসৈন্যে তাঁবু ফেলিলেন। সন্ধ্যাকালে বীর সেনাপতি মল্‌হররাও হোলকর পাথরডীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়া শুনিলেন, একটী বালিকা স্তোত্র পাঠ করিতেছে। সেই নবম বর্ষীয়া বালিকার বিশুদ্ধ বেদ-স্তোত্র-পাঠ শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বালিকা সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী। মলহররাও পরিচয় লইয়া জানিলেন যে,



বালিকাটী পাথরডী গ্রামের একজন সামান্য কৃষিজীবীর কন্যা। কন্যার পিতা আনন্দরাও শিন্দে পাথরডীর একজন অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং তিনি স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কৃষির কার্য্য করিতেন। কন্যাটীর নাম অহল্যাবাঈ।

বহুদিন অপুত্রক থাকিবার পর ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন এক জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলেন যে, এই কন্যা কালে রাজরাজেশ্বরী হইবে। স্নেহশীল পিতার অন্তর জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কন্যাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

মল্‌হররাও কন্যাটীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে আপনার পুত্রবধূ করিয়া জ্যোতিষীর বাক্যকে সফল করিতে চাহিলেন। মল্‌হররাওএর প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দরাও তখনি সম্মত হইলেন এবং একদিন শুভক্ষণে ইন্দোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মল্‌হররাও হোলকারের পুত্র খাণ্ডেরাওএর সহিত নবম বর্ষীয়া অহল্যাবাঈএর শুভবিবাহ হইয়া গেল। যে অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে সেদিনকার ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শক্তি-পুঞ্জ বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেই অন্তঃপুরে রাজবধূরূপে সামান্য কৃষিজীবীর কন্যা প্রবেশ করিলেন।

যদিও সেদিন মল্‌হররাও হোলকারের শক্তির উপর সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতি তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল, তবুও মল্‌হররাও স্বয়ং অতি সামান্য এক দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদিম বাস যে গ্রামে, তাহার নাম 'হোল্'; এইজন্য তাঁহারা আপনাদের হোলকর (মহারাষ্ট্র ভাষায় কর মানে অধিবাসী) বলিয়া পরিচয় দিতেন।

ইন্দোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাল্যে পশু চরাইতেন এবং তাহাই ছিল তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। আপনার ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব শৌর্য্যের বলে তিনি ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র-অধিপতি বাজীরাও পেশো-

য়ারের সৈন্যমণ্ডলীর একজন সামান্য সৈন্য হইতে প্রধান সেনাপতি হন। সেই সময় মোগল ও মহারাষ্ট্রে ভারতের একাধিপত্য লইয়া তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তখন মহারাষ্ট্রের শক্তির নিকট দিল্লীশ্বরের সমস্ত আধিপত্য বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ওধারে আফগানিস্থান হইতে আহ্‌মেদ শাহ্‌ আবদালি পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছেন। সমগ্র ভারত মহারাষ্ট্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, যদি এই অপূর্ব্ব ক্ষাত্র-শক্তি পুনরায় ভারতে এক অখণ্ড হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। হিন্দুর এই নব জাগরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তখন মল্‌হররাও হোলকর। বাজীরাও পেশোয়ার মল্‌হররাওএর অসামান্য শক্তিতে প্রীত হইয়া এক একটী বিজয়ের পর তাঁহাকে এক একটী করিয়া জায়গীর দান করিতে থাকেন। মালববিজয়ের পর মল্‌হররাও হোলকর সমগ্র ইন্দোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ উপহার পান।

অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা নিরূপণের জন্য পাণিপথে মহারাষ্ট্র ও আহ্‌মেদ শাহ্‌ আবদালির যুদ্ধ হয়। উহাই তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি পরাজিত হইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। মহারাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে তখন আত্ম-কলহ দেখা দিয়াছে। শক্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া মহারাষ্ট্রশক্তি আত্ম-কলহের ফলে সেই যে পড়িল, আর উঠিতে পারিল না। মল্‌হররাও হোলকর কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া আপনার রাজ্যে পলাইয়া আসেন।

অহল্যাবাঈ সামান্য কৃষিজীবীর ঘর হইতে একেবারে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তাদের গৃহে আসিয়া কিন্তু দিশাহারা হইয়া পড়িলেন না। তিনি শ্বশুর এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী ও বহু সদ্‌গুণময়ী শ্বশ্রূমাতা গৌতমবাঈএর নিকট হইতে যথাক্রমে রাজ-ধর্ম্ম ও হৃদয়-ধর্ম্মের সকল

শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহল্যাবাঈএর বয়স যখন মাত্র আঠারো বৎসর, সেই সময় কুম্ভেরী দুর্গ অবরোধ-কালে স্বামী খাণ্ডেরাও যুদ্ধে নিহত হন। নিদারুণ শোকে মর্ম্মাহতা হইয়া অহল্যাবাঈ স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবার মনস্থ করিলেন। চিতা প্রস্তুত হইল। সেই সময় বৃদ্ধ মল্‌হররাও কাঁদিয়া ফেলিলেন। অহল্যাবাঈ আপনার অসামান্য সেবা-ধর্ম্মে মল্‌হররাওয়ের পরিবারের সকলের চিত্ত, বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ সৈনিকটীর চিত্ত, সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাশ্রুনেত্রে মল্‌হররাও চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, খণ্ডুজী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তুমিও যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে বৃদ্ধ-হত্যার পাতকী হইবে।" অহল্যাবাঈএর চিতারোহণ আর হইল না।

মল্‌হররাও ঠিক করিলেন যে, অহল্যাবাঈএর চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য তাঁহাকে দিয়াই এই রাজত্ব-শাসন-কার্য্য চালাইতে হইবে। ধীরে ধীরে মল্‌হররাও সেই আঠারো বৎসরের বিধবাকে রাজকার্য্যের এক একটী দুরূহ কর্ত্তব্য দিয়া তাঁহাকে ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রাজ্যের আয়-ব্যয়, হিসাব-রক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ, রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা, সৈন্যবিভাগের উন্নতি-সাধন, ব্যয়-নির্দ্ধারণ, কর্ম্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ, রাজ্যের আয়ের ক্ষতি-বৃদ্ধি-নির্দ্ধারণ, এই সমস্ত দুরূহ ও জটিল রাজকার্য্যের ভার, যাহা অন্ততঃ তিন চারিটী মন্ত্রীর কর্ত্তব্য, তাহা একা অহল্যাবাঈ আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মল্‌হররাও ইন্দোর রাজ্য পরিচালনের সমস্ত ভার অহল্যাবাঈএর উপর দিয়া স্বয়ং বাফগাঁও নামক এক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজ্যের ভার লইয়াই অহল্যাবাঈ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আয়-ব্যয় হিসাব করিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যে

রাজ্যের আয় বাড়াইয়া তুলিলেন। রাজকার্য্য পরীক্ষা দ্বারা অহল্যাবাঈ স্বয়ং মল্‌হররাওএর বহু ভুল ত্রুটী পর্য্যন্ত বাহির করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের সময় মল্‌হররাও অহল্যাবাঈএর উপর সমগ্র রাজ্যের ভার দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

পাণিপথ-যুদ্ধে সেই শোচনীয় পরাজয়ের পর মল্‌হররাও আর মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুত্রবধূ এবং একটী অল্পবয়স্ক পৌত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তখন ইন্দোর-রাজ্যের চারিদিকে শত্রু। সেই অবস্থায় অহল্যাবাঈ স্বীয় অল্প-বয়স্ক পুত্র মালেরাওকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং রাজ্য-চালনা করিতে লাগিলেন কিন্তু অহল্যাবাঈকে চিরকাল আপনার অন্তরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহিরে স্থৈর্য্য বজায় রাখিতে হইয়াছে। অন্তরের পীড়ায় যখন মন শতচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বাহিরে তখন বিন্দুমাত্র অধীরতা নাই।

যৌবনের প্রারম্ভেই বৈধব্যকে বরণ করিতে হইল; বৃদ্ধ শ্বশুরের অনুরোধে সহমরণ ঘটিল না। সেই শ্বশুরও বিশাল রাজ্যের গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া পরলোক গমন করিলেন। একমাত্র পুত্র—কিন্তু সে পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে ও পাপাচারণে মাতৃহৃদয়ও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে কাহিনী পরে বলিতেছি। একমাত্র কন্যা মুক্তাবাঈএর বিবাহ দিলেন। মুক্তার একটী পুত্রকে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে রাখিতেন। সেই বালকটীর উপর তাঁহার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ স্নেহ বর্ষিত হইত; কিন্তু সেই বালকও কিশোর কাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই অকালে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার কিছুদিন পরে মুক্তাবাঈ বিধবা হইলেন। স্বামিপুত্র-শোকাতুরা মুক্তা বেদনায় আত্মহারা হইলেন এবং স্বামীর অনুগমন করিবেন স্থির করিলেন। সংসার-বন্ধন-হারা অহল্যাবাঈ সাশ্রু-নয়নে কন্যাকে চিতা-

রোহণে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মুক্তাবাই মাতার সে আবেদন শুনিলেন না। নর্ম্মদার তীরে স্বামীর পার্শ্বে মুক্তার চিতা সজ্জিত হইল। মাতা দেখিলেন, কন্যা চিতারোহণ করিতেছে। শোকে উন্মাদ হইয়া সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিতে যাইতেই, দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। নর্ম্মদার তীরে চিতাগ্নি সতীর পুণ্য দেহকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। মুক্তাবাঈ যেখানে স্বামীর সহিত সহমরণে চিতারোহণ করিয়াছিলেন, অহল্যাবাঈ সেখানে একটী মন্দির স্থাপন করেন। নর্ম্মদার তীরে সেই মর্ম্মর-চিহ্ন অপত্য-স্নেহের এক বিরাট প্রতীকস্বরূপ আজও বিরাজ করিতেছে।

বাহিরে যখন কঠোর হস্তে রাজ্যচালনা, যুদ্ধ ও বিগ্রহের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে হইতেছিল, এমন কি স্বহস্তে অসি ধরিয়া রণাঙ্গণে নামিতে হইতেছিল, অন্তরে সেই সময় বঞ্চিত-স্নেহের ক্ষুধা শত শিখায় সমস্ত নারী-হৃদয়কে পুড়াইয়া অঙ্গারে পরিণত করিতেছিল। অথচ অন্তরের এই নিদারুণ সংঘর্ষ কোনও দিন বাহিরের কার্য্যকে বিশৃঙ্খল করিতে পারে নাই। অহল্যাবাঈ অন্তরে ছিলেন মুক্তকাম তাপস-রমণী, বাহিরে ছিলেন সম্রাজ্ঞী।

যুবক মালেরাও অত্যন্ত ব্যভিচারী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। অহল্যাবাঈ ভাবিয়াছিলেন যে সিংহাসনে বসিলে হয়ত পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইবে। কিন্তু সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, মালেরাওএর ব্যভিচার ও পাপাচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি বিশেষ ভাবে মদ্যপান আরম্ভ করিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই সুরাতে অচৈতন্য হইয়া থাকিতেন। মত্তাবস্থায় তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদেরও বেত্রাঘাত করিতেন। মল্‌হররাও-এর বৃদ্ধ আত্মীয় তুকোজী হোল্‌কর একবার মালেরাওকে উপদেশ দিতে

যান। মালেরাও তাঁহাকে ভৃত্য দ্বারা অপমান করাইয়া তাড়াইয়া দেন। পুত্রের ব্যবহারে অহল্যাবাঈএর অন্তর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেব-দ্বিজ-সেবায় অবশিষ্ট জীবন নর্ম্মদার তীরে অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মালেরাও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অহল্যাবাঈ ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন এবং সর্ব্বদাই দানে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতেন। মালেরাও এই ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য তিনি নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কখনও দেয় বস্ত্রের অভ্যন্তরে অথবা কলসের অভ্যন্তরে জীবন্ত বৃশ্চিক রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহাই দান করিতেন। সেই বস্ত্র পরিতে গিয়া কত নিরীহ ব্রাহ্মণ বৃশ্চিকের দংশনে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, কত ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! সুরায় উন্মাদ মালেরাও সেই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে করতালি দিতেন, আর এই সমস্ত সংবাদে তাপসী অহল্যাবাঈএর অন্তর যে কি ভাবে বিচলিত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

একবার মালেরাও একজন শিল্পীকে সন্দেহক্রমে হত্যা করেন। কিন্তু পরে জানিতে পারেন যে লোকটী সত্যই নিরপরাধ। সেই ঘটনার পর তিনি শয্যাগত হন এবং বিকারগ্রস্ত অবস্থায় দেখিতেন যে সেই মৃত শিল্পীর প্রেতাত্মা তাঁহার প্রাণ-সংহারের জন্য আসিতেছে। হতভাগ্য মালেরাও সেই শয্যাতেই দেহত্যাগ করেন।

পুত্রের মৃত্যুর পর অহল্যাবাঈ স্থির করিলেন যে, বিশ্বস্ত আত্মীয় তুকোজী হোলকরের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। কিন্তু, সেই সময় ইন্দোরের শূন্য সিংহাসন লক্ষ্য করিয়া এক গভীর ষড়যন্ত্র মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। বীর মলহররাওএর পুত্রবধূ এবং বীরের

পত্নী অহল্যাবাঈ দেখিলেন যে, যে-রাজ্য তাঁহার শ্বশুর দীর্ঘ জীবন রণক্ষেত্রে যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহার জন্য স্বামী যৌবনে জীবন দিয়াছেন, তাহা কতকগুলি হীন ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে চলিয়া যাইবে। প্রভু-শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া অহল্যাবাঈ স্থির করিলেন যে, সন্ন্যাস স্থগিত রাখিয়া এই পূতবংশের মর্য্যাদা অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই সময় হইতেই অহল্যাবাঈ এর সম্রাজ্ঞী-মূর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠে।

মল্‌হররাও হোলকরের প্রধান-অমাত্য গঙ্গাধর যশোবন্ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, অহল্যাবাঈ নারী এবং একপ্রকার অসহায়। তাঁহাকে কিছু মাসহারা দিয়া কাশীতে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া দিলেই তিনি সুখী হইবেন। এই কল্পনা করিয়া গঙ্গাধর যশোবন্ত রাণী অহল্যাবাঈ-এর নিকট আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, "মাতৃশ্রী, এই শোকতাপময় পৃথিবীর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আপনার এখন কাশীধামে বাস করা শ্রেয়।" অহল্যাবাঈ আগে হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার কথা কহিবার পূর্ব্বেই এই নারী তাঁহার অন্তরের বাসনা জানিতে পারিয়াছেন। উত্তরে রাণী অহল্যাবাঈ বলিলেন, "আমার কাশীবাসের সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই—একথা সবার অপেক্ষা আমি ভাল জানি। আর আমার কর্ত্তব্য লইয়া অপর কোনও লোকের মাথা ঘামাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।" গঙ্গাধর যশোবন্ত দেখিলেন চাতুরীতে হইবে না। তিনি গোপনে তদানীন্তন পেশোয়ার পিতৃব্য রাঘোবাদাদা পেশোয়ার সহিত ইন্দোর-রাজ্য আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই রাঘোবাদাদা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের এক কলঙ্ক। তিনিই প্রথম জাতি-শত্রুরূপে ইংরাজের সাহায্য লইয়া মহারাষ্ট্র-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘোবা সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ইন্দোর রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন।

অহল্যাবাঈ সমস্তই অবগত হইলেন। মাহ্‌রাঠা নারীর অন্তরে ক্ষাত্র-শক্তি দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় গেল সে রিক্তা তাপসীর সকরুণ কোমল মূর্ত্তি, তাহার স্থলে বিকশিত হইয়া উঠিল সংহার-রূপিণী আদ্যাশক্তির মহিমা! প্রজাদের আহ্বান করিয়া বীরনারী কহিলেন, "এক কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ আর একজন পেশোয়া-বংশের কলঙ্ক আজ ইন্দোরের পবিত্র সিংহাসন গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাহারা ভাবিয়াছে আমি নারী। কিন্তু আমি শিলোদার (যুদ্ধোপজীবী অশ্বসৈনিকের জাতি) বংশের কন্যা। আমার শ্বশুর আজীবন অসি-হস্তে সংগ্রাম করিয়া এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমি স্বয়ং অসি-হস্তে সমরে যাইব। ইন্দোর রাজ্যে যে মানুষ থাকিবে, আমার পশ্চাতে আসিবে।"

অহল্যাবাঈএর এই তেজোদীপ্ত প্রকাশ দেখিয়া ইন্দোর-রাজ্যের সমস্ত প্রজা সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ওধারে অহল্যাবাঈ গোপনে দুই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে দিয়া তদানীন্তন পেশোয়া, ভোন্‌সলে, গায়কওয়াড়, সেনাপতি দাভাড়ে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট মারাঠা মণ্ডলেশ্বরের নিকট রাঘোবাদাদা ও গঙ্গাধর যশোবন্তের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া সাহায্যের জন্য স্বহস্তে পত্র লিখেন।

মারাঠা রমণীর অন্তরের তেজ-স্ফুলিঙ্গ মারাঠার বীরদেরও অন্তর স্পর্শ করিল। সকলেই এই বীর-বাণীতে মোহিত হইয়া সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। স্বয়ং মাধবরাও পেশোয়াও সৈন্য পাঠাইলেন।

অহল্যাবাঈ স্বয়ং যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ নিপুণ সেনাপতির মত "গাড়রা ঘেড়ী" নামক স্থানে বিভিন্ন সৈন্য-সমাবেশের আয়োজন করিলেন এবং কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া শত্রু-আগমনের সমস্ত পথে আগে হইতেই তাঁহার সৈন্য-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। সিপ্রা-নদীর

তীরে যেখান দিয়া রাঘোবাকে সৈন্য লইয়া পার হইয়া আসিতে হইবে, সেখানে তুকোজী হোলকরকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন।

গঙ্গাধর যশোবন্ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, একজন সহায়-সম্পদহীনা বিধবা রমণী এত অল্প সময়েব মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত সামরিক আয়োজন করিতে সমর্থ হইবে।

প্রভু-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ রাণী অহল্যাবাঈ সেদিন মুণ্ডিত-মস্তকে শিরস্ত্রাণ পরিলেন; বিধবার শুক্ল বসন ত্যাগ করিয়া সৈনিকের বাস পরিধান করিলেন, যে-নেত্র করুণায় তীর্থময় ভারতকে স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, সে-নেত্র হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তরবারি হস্তে হস্তীতে আরোহণ করিয়া মারাঠার কুলবধূ সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই বরাভয়মূর্ত্তি দেখিয়া সৈন্যরা আনন্দ-কোলাহলে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওধারে সিপ্রা-নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া তুকোজী রাঘোবাকে দূতমুখে বার্ত্তা পাঠাইলেন যে, যদি তিনি সৈন্য লইয়া সিপ্রা-নদী অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্বংস অনিবার্য্য। চতুর রাঘোবা বুঝিল, গায়কওয়াড়, ভোন্‌স্‌লা, পেশোয়া ও ইন্দোরের সম্মিলিত সৈন্যের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করিয়া অহল্যাবাঈ চারিদিকে যেরূপ প্রচার কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার সাহায্য করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাঘোবা যুদ্ধের সকল আশা ত্যাগ করিয়া চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। মালেরাওএর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি রাণী অহল্যাবাঈকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি একা ইন্দোরে গিয়া অহল্যাবাঈএর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রাঘোবা একা সিপ্রা-নদী পার হইয়া তুকোজীর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া অহল্যাবাঈকে দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। এইভাবে বিনা রক্তপাতে যে সমস্ত মিটিয়া গেল, তাহাতে তুকোজী সানন্দে রাঘোবাকে ইন্দোরে লইয়া আসিলেন। অকারণ রক্ত-ক্ষয় যে নিবারিত হইল তাহাতে অহল্যাবাঈও সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাসমাদরে পেশোয়ার পিতৃব্যকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

রাঘোবা একমাস কাল ইন্দোরে রহিলেন। তাঁহার অন্তরের বাসনা ছিল যে অহল্যাবাঈকে বুঝাইয়া যদি কোনও রকমে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে অহল্যাবাঈএর মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসে ইন্দোর-রাজ্য অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন।

ইন্দোরে থাকার সময় একমাস কাল কূটবুদ্ধি রাঘোবার সহিত অহল্যা-বাঈএর সেব্য ও সেবকের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা হয়। যাহাতে ইন্দোর-রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্য্যে পেশোয়াগণের সাহায্য গৃহীত হয়, তাহার জন্য রাঘোবা এই তর্কের সূচনা করেন। কিন্তু "পুণ্য-জ্যোতি-বিমণ্ডিতা" অহল্যাবাঈ রাঘোবার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমস্ত তর্কে তাঁহাকে পরাজিত করেন। যাহাকে জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার নিকট সর্ব্ব-রকমে পরাজিত হইয়া রাঘোবা ইন্দোর রাজ্য ত্যাগ করিয়া যান।

রাজনীতিবিশারদ অহল্যাবাঈ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে ইন্দোর রাজ্যের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে পেশোয়ার সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। সেইজন্য তিনি তদানীন্তন পেশোয়া মাধবরাওএর সহিত পত্র-বিনিময় করিয়া ব্যবস্থা করেন যে, পেশোয়া রাজ-দরবারে ইন্দোরের দূত হিসাবে অহল্যাবাঈএর দুইজন লোক থাকিবে। সেই দুইজন দূতের মধ্য দিয়া ইন্দোর ও পেশোয়া রাজ্যের যোগাযোগ অটুট থাকিবে। মাধবরাও তাহাতে স্বীকৃত হন এবং রাণী অহল্যাবাঈ

বিশ্বস্ত সেনাপতি তুকোজী হোলকরকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পেশোয়া দরবারে পাঠাইলেন। তুকোজীর সঙ্গে নরোগণেশ ও শিরাজগোপাল নামক আরও দুইজন বিশ্বস্ত লোককেও পাঠাইলেন। তুকোজীকে পেশোয়া দরবারে পাঠানর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে মারাঠা-মণ্ডলেশ্বরগণ তুকোজীকেই তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে সম্মান করিতে পারেন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা ছিল. যে, পরে তুকোজীর উপর রাজ্যভার সমর্পন করিয়া তিনি দানে•ধ্যানে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন।

শাসক-রূপে রাণী অহল্যাবাঈ প্রজাদের জননী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কখনও তাঁহার কোমলতার অন্যায় সুবিধা লইতে চাহিলে তিনি অতি কঠোর হইয়া উঠিতেন। অহল্যাবাঈ সিংহাসনে বসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতেন না যে, তিনি সম্রাজ্ঞী, প্রভুশক্তির আধার। স্থান বিশেষে কঠোরতা যে রাজধর্ম্ম তাহা তিনি ভাল রকমই জানিতেন এবং যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, মূর্ত্তিমতী করুণা হইয়াও রাণী অহল্যাবাঈ সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষায় পুরুষ-কঠোর হইয়াছেন। সেই সময়কার ভীল, পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুদের করুণায় ও স্নেহে তিনি যখন বশ করিতে পারিলেন না, তখন রাজ-ধর্ম্ম অনুযায়ী তাহাদের গ্রাম ধ্বংস করিয়া, কাহারও বা প্রাণদণ্ড দিয়া, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সেই দস্যুদের উৎপাত রহিত করেন।

প্রতিদিন তিনি রাজবেশে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যের সমস্ত বিচার স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। কোনও রাজকর্ম্মচারীর ত্রুটী দেখিলে, তিনি তাহার কঠোর শাস্তির বিধান করিতেন। বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না।

ইন্দোর রাজ্যে কোনও নিঃসন্তান প্রজা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয়

ধর্ম্মপত্নীকে দত্তক-পুত্র গ্রহণের আদেশ প্রদান না করিয়া গেলে, দত্তক-পুত্র গ্রহণের জন্য ঐ মৃত প্রজার পত্নীকে রাজার নিকট অনুমতি লইতে হইত। দত্তক-পুত্র না লইয়া ঐ পত্নী মরিয়া গেলে, সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে চলিয়া আসিত। রাণী অহল্যাবাঈ ঠিক করিলেন যে উক্ত অর্থের উপর রাজকোষের কোনও দাবী থাকিবে না। উহা পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য রাজ্যের মধ্যে কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে। পাছে কোনও কর্ম্মচারী এই ব্যাপারের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করে, সেইজন্য তিনি স্বয়ং এই বিভাগ তত্ত্বাবধান করিতেন এবং বহু রাজকর্ম্মচারীকে উৎপীড়ন করা এবং উৎকোচ গ্রহণ করার অপরাধে পদচ্যুত করেন। সেখানে কোনও ক্ষমা ছিল না। সেই সময় ভারতের অনেক রাজার রাজ্যে প্রজারা রাজ্যের মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, বা প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজান, শিবিকারোহণ, কিম্বা রাজপ্রাসাদ অথবা দুর্গ-প্রাঙ্গণে ছত্র-ব্যবহার করিতে পারিত না; তাহাতে নাকি রাজার প্রতি অসম্মান দেখান হইত। মহারাণী অহল্যাবাঈ এই হাস্যকর গৌরব আদায়ের প্রথা তুলিয়া দেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার সাহস ও প্রতিভার অনেক আখ্যায়িকা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায় যে, যখন মল্‌হররাও পরলোক গমন করেন, তখন তিনি ধনাগারে প্রায় ১৬ কোটী টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যান। রাঘোবা-দাদা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহার কিছু অংশ আত্মসাৎ করিবার জন্য অহল্যাবাঈকে লিখিয়া পাঠান যে, "সৈন্য-ব্যয়ের জন্য বর্ত্তমানে অর্থ-সঙ্কটে পড়িয়াছি। মল্‌হররাও পেশোওয়াদের কার্য্যেই প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখন পেশোয়াদের বিপদে সেই অর্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত, রাঘোবার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অহল্যাবাঈ বলিয়া

পাঠাইলেন, "ধনাগারের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আমি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দান-ধর্ম্মের জন্য রাখিয়াছি। যুদ্ধে প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবুও দানধর্ম্মের জন্য সংকল্পিত অর্থ অন্য কার্য্যে ব্যয় হইতে দিব না।" এই প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করিয়া রাঘোবা যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইন্দোর-রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। রাণী অহল্যাবাঈ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপনার পাঁচশত দাসীকে সৈনিকের বেশে সজ্জিত করাইয়া আপনি অশ্বারোহণে সৈনিক বেশে রাঘোবার সম্মুখীন হইলেন। অহল্যাবাঈ জানিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক কখনও রমণীর সহিত যুদ্ধ করিবে না। রাঘোবা এই ব্যাপার অবগত হইয়া যুদ্ধের আদেশ দিলেন কিন্তু সর্দ্দারগণ সকলেই অস্বীকৃত হইলেন। রাঘোবা নিরুপায় হইয়া অহল্যাবাঈকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "আপনার সৈন্য-সামন্ত কোথায়?" অহল্যাবাঈ চতুরতার সহিত উত্তর দিলেন, "আমরা শ্রীমন্ত পেশোয়াগণের সেবক। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজদ্রোহী হইতে চাহি না। তবে হোলকর বংশের ধর্ম্মার্থ-উৎসৃষ্ট সম্পত্তি রক্ষা করাও আমার ধর্ম্ম। সেই জন্য আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমাদের বধ করিয়া ধর্ম্মার্থ-রক্ষিত সম্পত্তি আপনি অধিকার করুন।" অহল্যার এই কৌশল-পূর্ণ উত্তরে পরাজিত হইয়া রাঘোবা সে-সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিলেন।

রাণী অহল্যাবাঈ সকল দিক দিয়া আত্মস্থা ছিলেন। কোনও চাটুবাক্য, কোনও মিথ্যামোহ তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। যেখানে তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেন, সেখানে তিনি নির্ম্মম হইয়া উঠিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অহল্যার অনুগ্রহ পাইবার আশায় তাঁহার গৌরবপূর্ণ এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পুরস্কারের আশায় ব্রাহ্মণ অতি মাত্রায় এবং নানা স্থলে মিথ্যা ভাবে অহল্যার প্রশংসা করেন। অহল্যাবাঈ গম্ভীর ভাবে সমগ্র গ্রন্থখানি

শুনিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাণী যখন সমগ্র গ্রন্থ শুনিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই বিস্তর পুরস্কার দিবেন। গ্রন্থ-পাঠ শেষ হইলে অহল্যাবাঈ গ্রন্থখানি স্বহস্তে লইয়া একজন কর্ম্মচারীকে উক্ত গ্রন্থখানি অবিলম্বে নর্ম্মদার জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তোষামদকারী ব্রাহ্মণের কোনও খবর লইলেন না।

কিন্তু আজ যে মূর্ত্তিতে অহল্যাবাঈ ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ের সিংহাসনের আসীন হইয়া আছেন, তাহা তাঁহার করুণাময়ী মূর্ত্তি! নয়নে করুণা, এক হস্তে দয়া, অপর হস্তে সেবা। সেদিনকার যে সমস্ত ক্ষুধিত মানব, নিরন্ন ভিখারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সাক্ষাৎভাবে এই মূর্ত্তিমতী করুণার স্নেহস্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছিল, তাহারা আজ নাই, কিন্তু করুণাময়ীর অমর স্মৃতিস্বরূপ আজও উত্তর ও মধ্যভারতের তীর্থসমূহ করুণার প্রস্তর-প্রতীকের মত বিরাজ করিতেছে।

কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, যে কোনও জীব রাণী অহল্যাবাঈএর করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না। পাখীরা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া কৃষকদের ক্ষতি করিত বলিয়া কৃষকরা পাখীদের নির্য্যাতন করিত। তিনি আকাশ-গামী পক্ষীদের আহারের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষেত্র করাইয়া দিয়াছিলেন। যখনই তিনি কোনও তীর্থে যাইতেন, ভূরি ভূরি খাদ্য জলস্রোতে দিতেন, জলচররা খাদ্য পাক। কাশীর অহল্যাবাঈ-ব্রহ্মপুরী, অহল্যাবাঈ-ঘাট বিশ্বেশ্বরের মন্দির, মণিকর্ণিকা-ঘাট, গয়ার-বিষ্ণুপাদমন্দির আজিও সেই করুণাময়ীর পুণ্য কীর্ত্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছে।

জীবনের অবশিষ্টাংশ রাণী অহল্যাবাঈ গঙ্গার তীরে মহেশ্বরক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করেন। রাজ্যের সমস্ত ভার তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বস্ত সেনাপতি তুকাজী হোলকরকে সমর্পন করেন। তুকাজী হোলকরের বংশধরগণই আজ ইন্দোরের হোলকর বলিয়া পরিচিত।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে নর্ম্মদার তীরে পুণ্যধাম মহেশ্বর-ক্ষেত্রে করুণাময়ী অহল্যাবাঈ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

মারাঠা কবি দেবী অহল্যাবাঈকে আদ্যাশক্তির অংশভূতা জ্ঞানে গাহিয়াছেন,—

"হে দেবি! তুমি নর্ম্মদা-তীর ত্যাগ করিতেছ না, কারণ নর্ম্মদা তোমার প্রিয়সখী। নর্ম্মদা গঙ্গারও সখী—সেই সখীত্ব-সূত্রেই কি তুমি এরূপ পূতহৃদয় হইয়াছ?"

# ঝাঁন্সীর রাণী

পুরোহিত বিবাহের সময় কন্যার বসনের সহিত বরের বসনের গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছিলেন। বর,—ঝাঁন্সীর অধিপতি গঙ্গাধর রাও, বধূ,—পেশাওয়াদের দেওয়ান মোরাপান্তের কন্যা মুনাবাঈ।

সমাগত সমস্ত নিমন্ত্রিতদের সম্মুখে বধূ মাথার লজ্জাবাস উন্মোচন করিয়া দিয়া বিরক্তি-সহকারে পুরোহিতকে বলিল, "ভাল করিয়া গ্রন্থি-বন্ধন কর।"

কন্যার নিলর্জ্জতা দেখিয়া সমাগত আত্মীয়স্বজন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু কন্যার বিশেষ কোনও অপরাধ ছিল না, কারণ শিশুকাল হইতে বালিকা পেশাওয়ারদের বালকদের সঙ্গে খেলা করিত এবং পুরুষের মত সকল শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে। লজ্জাবাসে সে অভ্যস্ত ছিল না।

মুনাবাঈ লক্ষীবাঈ নাম লইয়া ঝাঁন্সীর রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। কিন্তু পুরোহিত ভাল করিয়া বিবাহের গ্রন্থি বাঁধিলেও কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই মহাকালে অনায়াসে সে-বন্ধন চিরতরে শিথিল করিয়া দিল।

ঝাঁন্সীর শাসক গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রাজ্যের প্রথানুযায়ী অপুত্রক থাকায় গঙ্গাধর রাও মৃত্যুর পূর্ব্বে আনন্দ রাও নামক এক বালককে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ সেই নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইংরাজের মনঃপূত হইল না। তদানীন্তন ইংরাজ-গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসী ঝাঁন্সীকে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং সেখানে একজন বৃটিশ এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন।



আজ হইতে ঝাঁন্সীর রাজ্য বৃটিশ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইল, এই আদেশ-লিপি ও ঘোষণা-পত্র লইয়া মেজর এলিস্ ঝাঁন্সীর রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। দরবার মহলে পর্দ্দার আড়ালে বিধবা-রাণী লক্ষ্মীবাঈ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এলিস্ সাহেব ঘোষণা-পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। পর্দ্দার আড়াল হইতে মেঘ-মথিত ধ্বনি আসিল, ( 'মেরা ঝাঁন্সী দেঙ্গা নেহি' ! ) আমার ঝাঁন্সী আমি দিব না ! লক্ষ্মীবাঈএর প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইংরাজ ঝাঁন্সী খাস করিয়া লইল। রাজবাটী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীবাঈকে ইংরাজ-অধিকৃত কেল্লার প্রাসাদে উঠিয়া আসিতে হইল। লক্ষ্মীবাঈ স্থির করিলেন, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ইংলণ্ডে কোর্ট-অব-ডিরেক্টরদের নিকট একবার আবেদন করিয়া দেখিবেন। এই উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালীকে তিনি বিলাতে পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানেও কোন ফললাভ হইল না।

সেই সময় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের লেলিহান শিখা বঙ্গ হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত রক্ত-আলোয় জ্বলিয়া উঠে। ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য তরবারি হস্তে ঝাঁন্সীর রাণী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃটিশ-সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সহিত তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। রমণীর শক্তিতে সেদিন বৃটিশ-সৈন্যকেও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল।

তারপর একদিন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁহার ভগ্নী যখন সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় পশ্চাৎ-দিক হইতে অতর্কিতে বৃটিশ-সৈন্য গুলি ছুঁড়িয়া দুই ভগ্নীকে নিহত করে।

স্বহস্তে ঝাঁন্সীকে আর দিতে হইল না—ঝাঁন্সীর রাণী আপনাকেই তাহার আগে দিয়া দিলেন। ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁন্সীতে প্রবেশ করিয়া হত্যার তরঙ্গে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে প্লাবিত করিল।

দুই ভগ্নীর দেহ সৈন্যরা চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করিল। বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়াইয়া অগ্নি-তপ্ত পবন সেই পূত চিতা-ভস্মকে ভারতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

# রাণী ভবানী

অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙ্গালার শোকান্ধকারময় যুগকে পরিপূর্ণ জ্যোতিতে আজও আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ও ষড়যন্ত্রের যুগে রাণী ভবানী বাঙ্গালী বিধবা-রমণী হইয়া প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া সগৌরবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এই বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর বার্ষিক আয় সেই সময় ১ কোটী ৫০ লক্ষ ছিল এবং তিনি স্বয়ং নবাব-রাজ্যের সরকারে ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন।

রাণী ভবানীর জীবন বুঝিতে হইলে সেই সময়কার বাঙ্গালার শাসন-ব্যাপার এবং নাটোরের রাজ-পরিবারের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। এইখানে সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিব।

ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর অথবা ভারতের সম্রাট। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত বিরাট মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কেবল মাত্র দিল্লীর রাজ-সরকারে বার্ষিক কর দিয়াই সমস্ত অধীন রাজাদের কর্ত্তব্য চুকিয়া যাইত; ইহা ব্যতীত তাঁহারা স্ব স্ব দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই একরকম রাজত্ব করিতেন। যখনই রাজস্ব আদায়ে গোলমাল হইত, তখনই দিল্লীর সরকারের টনক নড়িত। কোন কোন স্থানে দিল্লী হইতে রাজ প্রতিনিধিরূপে রাজার সমস্ত শক্তি দিয়া লোক পাঠান হইত, তাঁহারাই স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা হইতেন এবং প্রতি-

বৎসরে দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ ছিল। এই সমস্ত শাসন-কর্ত্তা স্ব স্ব প্রদেশের জমিদারগণের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন এবং যথাসময়ে রাজস্ব দিলেই এই সমস্ত জমিদারগণও এক রকম স্বাধীন ভাবেই স্ব স্ব এলাকার মধ্যে রাজত্ব করিতে পারিতেন।

১৭০১ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র আজিমকে রাজ-প্রতিনিধি অর্থাৎ নবাব নাজিম করিয়া এবং স্বীয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মুর্শিদ কুলি খাঁকে নবাব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে পাঠান। তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল ঢাকা শহর। বঙ্গদেশ হইতে রাজস্ব আদায়ে তখন গোলমাল হইতেছিল বলিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই ব্যবস্থা করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াই প্রথম বৎসরে এক কোটী টাকার রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাইলেন। এই টাকা পাইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

রাজস্ব-আদায়ের হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিবার সময় ঢাকা শহরে প্রত্যেক জমিদার এক এক জন করিয়া মোক্তার নিযুক্ত রাখিতেন। এই সমস্ত মোক্তারের উপর জমীদারগণের মান, সম্মান, প্রতিপত্তি অনেকাংশে নির্ভর করিত। এই সমস্ত মোক্তারের সহিত আবার সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর সম্রাটের নিযুক্ত 'কানুন্‌গো'দের কাজ কারবার ছিল। এই 'কানুন্‌গো'দের অসীম ক্ষমতা ছিল। নবাব-দেওয়ানের হিসাব-নিকাশ-পত্র পরীক্ষা করাই ছিল ইঁহাদের প্রধান কাজ। এই রকম দুইজন কানুনগো নবাব-দেওয়ানে নিযুক্ত হইত। দিল্লীতে বার্ষিক রাজস্ব পাঠাইবার সময় হিসাব-পত্রে এই দুই জন কানুন্‌গোর নিজ নামাঙ্কিত মোহর না থাকিলে তাহা দিল্লীর সম্রাটের নিকট গ্রাহ্য হইত

না। সুতরাং নিম্ন পদবীর হইলেও এই দুই জন কানুনগোকে সন্তুষ্ট রাখিয়াই নবাব-দেওয়ানকে চলিতে হইত।

এই সময় পুঁটিয়ার মহারাজার পক্ষ হইতে মোক্তার হইয়া রঘুনন্দন বলিয়া এক ব্যক্তি ঢাকায় আসেন। এই রঘুনন্দনই প্রকৃতপক্ষে নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

রঘুনন্দন স্বীয় প্রতিভাবলে সামান্য অবস্থা হইতে এক বিরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পিতার নাম কামদেব মৈত্রেয়। কামদেব রাজশাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার তৎকালীন মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে অতি সামান্য বেতনে বারইহাটী গ্রামের তহশীল আদায় করিতেন। তাঁহার তিনপুত্র, জ্যেষ্ঠ রামজীবন, মধ্যম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম। সেই সময় রাজসরকারে উচ্চপদ পাইতে হইলে ফার্শী ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। রামজীবন ও রঘুনন্দন উভয়েই অতি অল্প কালের মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্শী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং প্রতিভাবলে দুই ভ্রাতাই পুঁটিয়ার রাজ-সরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। দুই ভ্রাতার মধ্যে হিসাব-নিকাশ কার্য্যে রঘুনন্দনের প্রতিভা সমধিক থাকায় মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনকে মোক্তার করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন। ঢাকা-দরবারে ফার্শীতেই হিসাব-নিকাশের এক সহজ পন্থা আবিষ্কার করার জন্য তিনি অচিরেই নবাব-দেওয়ানে একজন বিখ্যাত কর্ম্মচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিভায় মুর্শিদ কুলি খাঁ বিমুগ্ধ হইলেন। নবাব আজিম ওসমান ও মুর্শিদ কুলি খাঁর চেষ্টায় রঘুনন্দন নবাব সরকারের নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময় মুর্শিদ খাঁ ও নবাব আজিম ওসমানের সহিত সংঘর্ষ বাঁধিতে থাকে। ক্রমশঃ এই ব্যাপার প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল।

নবাব আজিম ওসমান মুর্শিদ কুলি খাঁকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ দিল্লীর সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে কাল বিলম্ব না করিয়াই তিনি স্বীয় পৌত্রকে পাটনার নবাব করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন এবং মুর্শিদ কুলি খাঁকে হিসাব-নিকাশ সাক্ষাৎ-ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য দিল্লীতে আহ্বান করিলেন।

নবাব আজিম ওসমান দেখিলেন যে, মুর্শিদ কুলি খাঁ যদি সম্রাটের সম্মুখে হিসাব-পত্র উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর কথাই বিশ্বাস করিবেন এবং মুর্শিদ কুলি খাঁ তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নিশ্চয়ই সম্রাটকে বলিয়া দিবে। সুতরাং সম্রাটের নিকট যাহাতে মুর্শিদ কুলি খাঁ অপদস্ত হন, নবাব আজিম ওসমান তাহার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, নায়েব কানুনগো যদি হিসাব-নিকাশ পত্রে স্বীয় নাম-মোহর না দেন, তাহা হইলে মুর্শিদ কুলি খাঁ দিল্লীর দরবারে হিসাব-পত্র উপস্থিত করিতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া নবাব আজিম ওসমান ভবিষ্যতের লোভ দেখাইয়া রঘুনন্দনকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং তিনিও রঘুনন্দনকে অনুরোধ করিলেন যে নবাব আজিম ওসমানের কথা যেন তিনি না শুনেন। রঘুনন্দন উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। হিসাব-পত্রে দুই জন কাননগোর স্বাক্ষরই চাই, কিন্তু অপর একজন নবাব আজিম ওসমানের প্ররোচনায় পূর্ব্ব হইতেই মুর্শিদ কুলি খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। মুর্শিদ কুলি খাঁর সমস্ত মান-মর্য্যাদা সেদিন রঘুনন্দনের উপর নির্ভর করিয়া ছিল এবং রঘুনন্দন সেদিন অনেক বিবেচনা করিয়া সম্রাটের পৌত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর হিসাব-পত্রে নিজ নামের মোহরাঙ্কিত করিলেন। এই কার্য্যের জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁ

আজীবন রঘুনন্দনের উপর কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ অচিরেই রঘুনন্দন বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইতে পারিয়াছিলেন।

একমাত্র রঘুনন্দনের স্বাক্ষর লইয়াই মুর্শিদ কুলি খাঁ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বিপুল উপঢৌকন এবং অর্থে প্রীত হইয়া সম্রাট দুইজন কানুনগোর স্বাক্ষরের কথাই তুলিলেন না। তাহা ছাড়া রঘুনন্দনের সুখ্যাতি দিল্লীর দরবারেও পৌছিয়াছিল। সম্রাট মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করিলেন।

নবাব হইয়া ঢাকায় আসিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ রঘুনন্দনকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করিলেন এবং তাঁহাকে 'রায় রাঁইয়ান' উপাধি দিলেন। রঘুনন্দনের পরামর্শে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা শাসিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সময় জমিদারগণ স্ব স্ব এলাকার মধ্যে একরকম স্বাধীন ভাবেই জমিদারী চালাইতেন অথবা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রীতিমত সৈন্য ছিল। অনেক জমিদার নবাবকে অগ্রাহ্য করিত, যথা-সময়ে কর দিত না, কেহ কেহ করই দিত না। মুর্শিদ কুলি খাঁ নবাবী পাইয়া যাহাতে রাজস্ব নিয়মিত আদায় হয়, তাহার কঠোর ব্যবস্থা করিলেন এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহার 'নাত-জামাই' মোহাম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। রেজা খাঁর কঠোর শাসনে ও পীড়নে বঙ্গের জমিদারকুলে এক ত্রাসের সঞ্চার হইল। রাজস্ব না দিতে পারিলে, ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, ইহা রাজ-নিয়ম। এই নিয়মের বলে বহু ভূম্যধিকারী ভূমি-চ্যুত হইল। অনেকে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার করার ফলে সংঘর্ষে বিলুপ্ত হইল. অনেকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এখন এই সমস্ত পরিত্যক্ত ভূমির একজন করিয়া নূতন জমিদার সৃষ্টি

করার প্রয়োজন হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ এই সমস্ত পরিত্যক্ত জমিদারী রঘুনন্দনকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃ ভক্ত রঘুনন্দন সমস্ত সম্পত্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবনকে দেওয়াইলেন। রামজীবন এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নাটোরে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে একটী বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সেই খানেই অবস্থান করিলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিলেন এবং সৈন্য ইত্যাদি রাখিবার ব্যাপারেও তাঁহাকে বিশেষ সুবিধা দিলেন। ইহাই হইল নাটোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে রাজস্ব-অনাদায়ের জন্য যত ভূ-সম্পত্তি স্বত্বহীন হয়, তাহা সমস্তই মুর্শিদ কুলি খাঁ রামজীবনকে দিয়াছিলেন। যশোহরের বিখ্যাত ভুইঞা সীতারাম রায়ের সম্পত্তিও এই নাটোররাজের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহা অতীব গ্লানির ও কলঙ্কের কথা যে, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন ব্যক্তির অন্তর হইতে স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নির্ম্মম ভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য বাঙ্গালী রঘুনন্দন এবং তাঁহার সুযোগ্য কর্ম্মচারী দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়কেই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। দয়ারাম রায়ের কৌশলেই সীতারাম রায় অবশেষে পরাস্ত হইয়া লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনীত হন। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

সীতারাম রায়ের ৭০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দিল্লীর সম্রাট রাজা রামজীবনকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন। তখন নাটোর রাজ্যের বার্ষিক আয় দেড় কোটী টাকা এবং এতবড় জমিদার বঙ্গদেশে তখন আর কেহই ছিলেন না। দয়ারাম রায় এই বিরাট রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। যদিও তিনি লেখাপড়া খুব বেশী জানিতেন না, তথাপি তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত

সাহস অসীম ছিল। দেওয়ান রঘুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেবতার তুল্য শ্রদ্ধা করিতেন এবং এবং যখনই নবাবের নিকট হইতে কোনও জমিদারী পাইতেন, তখনই তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়া দিতেন।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সহসা মহারাজ রামজীবনের একমাত্র পুত্র মহারাজ-কুমার কালিকাপ্রসাদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার কিছুকাল যাইতে না যাইতে রঘুনন্দনও দেহত্যাগ করিলেন। সহসা এই দুই ভীষণ শোকে মহারাজ রামজীবন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং সমস্যা হইল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হইবে। যদিও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবকীপ্রসাদ বর্ত্তমান ছিল, তথাপি তিনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করাই স্থির করিলেন এবং রাজসাহী জেলার রসিক রায় খাঁ ভাদুড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র রামকান্তকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেবকীপ্রসাদ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং মনে মনে নানারকম চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মহারাজ রামজীবন তাঁহাকে ছয় আনা অংশ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবকীপ্রসাদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। মহারাজ রামজীবনের দত্তকপুত্র এবং নাটোর-রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রামকান্তই রাণী ভবানীর স্বামী।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন্ গ্রামে রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। তিনি একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। রাণী ভবানীর যখন আট বছর মাত্র বয়স, তখন নাটোরের ভবিষ্যৎ মহারাজ রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহা-সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রাণী ভবানী পিতৃ-গৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ধারাপাতের অঙ্ক শিখিবার সময় তিনি হয়ত ভাবেন নাই যে, একদিন তাঁহাকে কোটী কোটী টাকার হিসাব নিজহাতে দেখিতে হইবে। স্বামী-

গৃহে আসিয়া রাণী ভবানীর শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় এবং এক উচ্চশিক্ষিতা ব্রাহ্মণী-মহিলার সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে সংস্কৃত, ব্যাকরণ, পুরাণ, এবং সংস্কৃত-রাজনীতিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বামীর নিকট বাল্যকাল হইতেই জমিদারী বিষয়ে শিক্ষা লইতেন। অতি অল্প-কালের মধ্যে জমিদারী বিষয়ে বালিকা-বধূ এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, প্রবীণ দেওয়ান দয়ারাম অনেক সময়ে অনেক জটিল বিষয়ে রাজ-বধূর সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন।

রামকান্তের বিবাহের বৎসরই মহারাজ রামজীবন পরলোক গমন করেন। যুবক মহারাজ রামকান্ত প্রভুভক্ত বিচক্ষণ দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এই সময় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে এক মহা-বিপ্লবের ও অশান্তির যুগ সূচনা হয়। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পর নবাব সুজা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সুজা খাঁ বার্দ্ধক্য-জনিত অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নামে রাজত্ব পরিচালন করিতেন। সরফরাজ খাঁ আপনার বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য সকলের অপ্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় বঙ্গে নানা-প্রকারের ব্যভিচার মাথা তুলিয়া দেখা দিতে লাগিল। সুজা খাঁর আমলে আলীবর্দ্দী খাঁ নামক একজন সৈন্যবিভাগের উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। সুজা খাঁ আলীবর্দ্দী খাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাই হইল সরফরাজ খাঁ ও আলীবর্দ্দী খাঁর মধ্যে মনান্তরের কারণ। সুজা খাঁ একটা আসন্ন গৃহ-বিপ্লব আশঙ্কা করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁকে পাটনার শাসন-কর্ত্তা করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে সরফরাজ খাঁর অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। সুজা খাঁর মৃত্যুর পর আলীবর্দ্দী খাঁ ও সরফরাজ খাঁতে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ

গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসে আলীবর্দ্দী খাঁর মত প্রজাবৎসল নবাব বিরল বলিলেই হয়; কিন্তু এই আলীবর্দ্দী খাঁর আমলে ভাগ্যক্রমে কিছুকালের জন্য রাণী ভবানী সর্ব্বপ্রথম বিপদের সম্মুখীন হন। দেবকীপ্রসাদ আপনাকে নাটোর-রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ভাবিতেন এবং তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টায় ছিলেন, কি উপায়ে মহারাজ রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করা যায়। মহারাজ রামকান্তের নাটোর রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে অন্যায্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সুজা খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর দরবারে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন তাঁহার চেষ্টার কোনও ফললাভ হয় নাই

আলীবর্দ্দী খাঁ যখন নূতন নবাব হইয়া আসিলেন, তখন দেবকী-প্রসাদের চক্রান্ত সফল হইল। দেবকীপ্রসাদ আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত দেখা করিয়া জানাইলেন যে, তিনিই নাটোর-রাজের ন্যায্য উত্তরাধিকারী; কারণ অপুত্রক মহারাজ রামজীবনের তিনিই একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। রাম-কান্তকে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে পুনরায় নাটোরের গদিতে বসান হইলে তিনি বর্ত্তমান রাজস্বের দ্বিগুণ রাজস্ব দিতে পারিবেন। রামকান্ত গরীবের ছেলে, এত বড় জমিদারী শাসনে সে একান্ত অযোগ্য। আলীবর্দ্দী খাঁ তখন বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক গূঢ় রাজনীতি অথবা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চিনিতেন না এবং তখন তাঁহার টাকারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য তিনি দেবকীপ্রসাদকে সনদ্ দিয়া নাটোরে পাঠাইলেন।

নবাবের সনদ্ পাইয়া বীর-দর্পে দেবকীপ্রসাদ নাটোরে প্রবেশ করিয়া রামকান্ত ও তাঁহার যুবতী স্ত্রী রাণী ভবানীকে নাটোরের রাজ-

প্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রামকান্ত স্ত্রীকে লইয়া মুর্শিদাবাদে ধনকুবের জগৎ শেঠের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীঘাপতিয়াতে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে দিনপাত করিতেছিলেন। মহারাজ রামকান্তের দুর্গতির কথা শুনিয়া তিনিও মুর্শিদাবাদে আসিলেন এবং স্থির হইল যে, তিনি ও জগৎ শেঠ মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে লইয়া রাজদরবারে যাইবেন। রাজদরবারে উপঢৌকন দিবার জন্য রাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার জগৎ শেঠের নিকট বাঁধা রাখিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। উপঢৌকন সহ নবাব সমীপে উপস্থিত হইয়া দয়ারাম নূতন নবাবকে রাজসাহী জমিদারীর প্রকৃত অবস্থা ও তাহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কে, তাহা প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ নিজের ক্রটী বুঝিতে পারিয়া নাটোর রাজ্যের খাতাপত্র সমস্ত পরীক্ষা করিয়া পুনরায় রামকান্তকেই নাটোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নাটোরের প্রজারাও বাঁচিল, কারণ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেবকীপ্রসাদ নানাপ্রকারের অনাচারে ও অত্যাচারে সমস্ত রাজসাহী প্রদেশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর রাণী ভবানীর পরামর্শ অনুসারে সর্ব্বপ্রথম দেবকীপ্রসাদের আমলে প্রজাদের যে সমস্ত সর্ব্বনাশ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হইল। যে সমস্ত প্রজার ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাজকোষের অর্থে তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইল, খাজনা অনাদায়ের জন্য যাহাদের জমিদারী হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, তাহাদের পুনরায় আহ্বান করিয়া আনা হইল। রাজ্যাভিষেকের দিন নাটোর সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়-স্বজন ও বহু বরেণ্য ব্যক্তির আনন্দধ্বনিতে আবার ভরিয়া উঠিল। প্রজারা বুঝিতে পারিল, রাজ-সিংহা-

সনের পাশে যিনি বসিয়া থাকেন, তিনি শুধু রাজ-মহিষী নন, তিনি লোক মাতাও বটে।

সেই সময় বঙ্গে বর্গীর উৎপাত আরম্ভ হয়। সমগ্র বঙ্গদেশ এই বর্গীর আতঙ্কে শঙ্কিত হইয়া উঠে। চারিদিকে অশান্তি দাবাগ্নি-শিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। স্বয়ং নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ এই বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণে অসমর্থ হইয়া 'চৌথ' অথবা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্বের চারি অংশের এক অংশ দিয়া তাহাদের প্রতি বৎসরে সন্তুষ্ট করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামার সুবিধা লইয়া ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অরাজকতা ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে অকস্মাৎ মহারাজ রামকান্ত ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। রাণী ভবানীর তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স। সমস্ত বিপদ মাথায় করিয়া সেই ঘন-দুর্য্যোগের মধ্যে রাণী ভবানী শুদ্ধচারিণী হিন্দুবিধবা হইয়াও বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ সেই অর্দ্ধ-বঙ্গের শাসনের ভার লইলেন এবং এরূপ দক্ষতার সহিত তিনি রাজ্য-পরিচালনা করেন যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বয়ং নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ স্বীয় পরিবারবর্গের নিরাপদের জন্য নাটোরের নিকট রাম-পুর বোয়ালিয়ারে তাঁহাদের রাখেন। বর্গীর উৎপাত হইতে তাঁহার জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য রাণী ভবানী পশ্চিম হইতে আনীত লোকদের লইয়া একটী সৈন্যবাহিনী সংগঠন করেন।

সেই বিরাট জমিদারী রাণী-ভবানীর নখ-দর্পণে ছিল। শাসন-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখিতে পারিতেন না এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি নিজে এমনভাবে সমস্ত জমিদারী পরিচালন করেন যে, এত বড় বর্গীর হাঙ্গামার পর, নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় খাজনা কখনও বাকি পড়ে নাই, অথচ প্রজারাও নিপীড়িত হয় নাই। একদিকে তিনি ছিলেন স্থির, ধীর, শাসনকর্ত্তা, অপরদিকে তিনি ছিলেন, একান্ত

কোমলা, বাঙ্গালীর মেয়ে, দানে যাহার আনন্দ, তপস্যায় যাহার শান্তি, স্নেহে যাহার পরিসমাপ্তি।

রাণী ভবানীর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শৈশবেই পুত্রটী মারা যায়। কন্যাটীর নাম তারাদেবী। খাজুরা-গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পরের বৎসরই তারাদেবী বিধবা হন। রাণী ভবানী কন্যাকে জমিদারী বিষয়ে সমস্ত শিক্ষা নিজহাতে দিয়াছিলেন, সেইজন্য সেই বিরাট রাজত্ব পরিচালন কার্য্যে তিনি বিধবা কন্যাকে তাঁহার প্রধান সহায়ক করিয়া লইয়াছিলেন।

বিধবা হইবার পর তিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেন। কুড়ি লক্ষ প্রজার শাসন-কার্য্যের অবসরে তিনি প্রতিদিন স্বীয় হস্তে হবিষ্যান্ন পাক করিতেন এবং রাত্রি চার দণ্ডের সময় শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান ও পূজার পর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়া রাজপুরীর সকল মহিলাকে শুনাইতেন। তাহার পর রাজ-কার্য্যে মনোযোগ দিতেন। বিধবা হইবার পর তিনি ভূমি-শয্যাতেই শয়ন করিতেন।

আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র বিলাসী সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে রাজ্যের যেটুকু আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, সিরাজদ্দৌলার আমলে তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নানাপ্রকারের অত্যাচারে বঙ্গদেশে তখন একটা মহা অশান্তিকর যুগ উপস্থিত হয় এবং যুবক সিরাজের এমন শক্তি ও ব্যক্তিত্ব ছিল না যে, তিনি সেই অশান্তিকে দমন করিতে পারেন। নবাবী আমলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখন হিন্দুসন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-আন্দোলনের চেষ্টা হয়। ইহাই ইতিহাসে Sannyasi

Rebellion বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দলের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। কথিত আছে যে, সিরাজদ্দৌলা রাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবীর অসামান্য রূপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার বাসনা জানাইয়া পত্র লেখেন। রাণী ভবানী বার বার অপমান করিয়া সেই পত্রবাহককে ফিরাইয়া দেন। রাণী ভবানী তখন মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে বড়-নগর রাজবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় সিরাজের সৈন্য আসিয়া বড়নগর আক্রমণ করে। রাণী ভবানী তারাদেবীকে লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইয়া মস্তরাম বাবাজী নামক এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীই পরে রাণী ভবানী ও তারাদেবীকে নির্ব্বিঘ্নে নাটোরে পৌঁছাইয়া দেন।

সেই সময় সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম লইয়া যে সমস্ত ইংরাজ-ব্যবসায়ী ভারতের উপকূলে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্লাইভ নামক একজন সৈনিক ভারতের চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অন্তরে এক প্রবল বাসনা পোষণ করে যে,এই স্বর্ণ-প্রসূ দেশে সে ইংলণ্ডের রাজ-পতাকা উড়াইবে। ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, কেমন করিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে এই দেশের লোকেরই সহায়তায় ক্লাইভ এই বিরাট দেশকে ইংলণ্ডের হাতে তুলিয়া দেন।

ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সেই সময়কার সমস্ত শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের ঐতিহাসিক-গৃহে অবশেষে বাঙ্গালার বিভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিদের পরামর্শ-সভা বসিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সেনাপতি মোহনলাল,রাজা নন্দকুমার,রাজবল্লভ,সেনাপতি দুর্ল্লভরাম, সেনাপতি মীরজাফর সকলেই সেই সভায় যোগদান করেন। রাণী ভবানী চিকের আড়ালে থাকিয়া সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ক্লাইভ রাজ্যলোভী মীরজাফরকে

যাহা বুঝাইয়াছিল, সভার সকলে তাহাই বিশ্বাস করিল। ক্লাইভ নিঃস্বার্থ হিতৈষণার জন্য এই কার্য্যে নামিয়াছে, রাজ্য-গ্রহণে তাহার কোনও আসক্তি নাই। কিন্তু সেদিন চিকের আড়ালে থাকিয়া রাণী ভবানী সভার এই সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণিয়াছিলেন। তিনিই একমাত্র সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে সকলকে বারণ করেন। তাঁহার মতে সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিতে হইলে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহারাই সে কার্য্য করিতে পারেন।

কিন্তু সেদিন একজন রমণীর কথা গ্রাহ্য হয় নাই এবং তাহার ফলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর আম্র-ক্ষেত্রের আড়ালে হতভাগ্য সিরাজের ভাগ্যের সহিত ভারতের ভাগ্য-রবি যে অস্তাচলে গেল, কবে তাহা আবার সমুদিত হইবে কে জানে! ২৯শে জুন মাত্র সাত শত সৈন্য লইয়া বিজয়ী ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন।

তারপর কয়েক বৎসর বাঙ্গালাদেশে যে অরাজকতা ও অনাচার চলিতে থাকে, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেই চলে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ শক্তিহীন মোগলসম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজকর দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ্ আদায় করেন। রাজকার্য্যে তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত কখনও কাহাকে বসাইয়াছেন, আবার তাহাকে নামাইয়াছেন, এমনি করিয়া মীরজাফর, মীরকাশিম প্রভৃতি বাঙ্গালার মসনদে নবাবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়া যান।

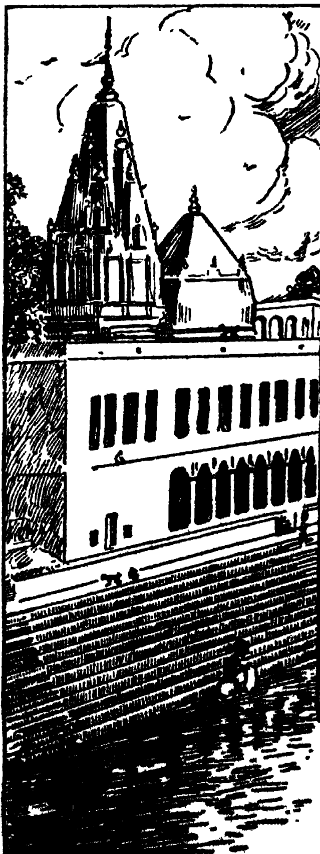
সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অসাধুতা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার ফলে বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্য মুমূর্ষু হইয়া উঠিতেছিল। রাণী ভবানীর রাজ্য তখন বাণিজ্য-শিল্পে বঙ্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজ-কুঠিয়ালগণ রাণীর রাজ্যে তাহাদের বাণিজ্যালয় স্থাপন

করিতে লাগিলেন এবং নানা ব্যাপারে রাণীর সহিত কলহ হইতে লাগিল। যে উপায়ে বাঙ্গলার বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্প সমূলে উচ্ছিন্ন হয়, তাহার অমানুষিক অনুষ্ঠানের এই সময় সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে স্থিরভাবে রাণী আপনার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দরিদ্রদের সেবায় তিনি তাঁহার সমগ্র মন নিয়োজিত করিলেন। জলাভাব দূর করিবার জন্য উত্তর বঙ্গের শত শত স্থানে রাণী ভবানী বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইলেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাভাব দূর করিবার জন্য তিনি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রচারের জন্য ব্যয় করিতেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আর স্বাধীনভাবে মাথা তুলিয়া জমিদারী করিতে হইবে না।

১১৭৪ সালে বঙ্গদেশে এক ভীষণ অজন্মা হয়। তাহার ফলে ১১৭৬ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা সমগ্র দেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিয়া যায়। ইহাই ইতিহাসে বিখ্যাত ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর বলিয়া খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া যায়। গ্রামের পর গ্রামে শ্মশান-শিবার দিবা-চীৎকারে অকল্যাণের জয়-যাত্রা ঘোষিত হইত, ঘরে ঘরে শুধু গলিত শব-দেহ পড়িয়া থাকিত। এই ভয়াবহ মৃত্যু ও ত্রাসের মধ্যে রাণী ভবানীর মাতৃ-হৃদয় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। আর্ত্তরক্ষার জন্য তিনি সেদিন অন্নপূর্ণার মতই বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজাদের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে রাজবৈদ্য নিযুক্ত করিলেন, রাজ-কোষের অর্থে দীর্ঘকালস্থায়ী শত শত অন্নসত্র খোলা হইল। প্রজাদের দেয় খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সেদিন অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী সেই বিধবা বাঙ্গালী ব্রতধারিণী নারী লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-রক্ষা করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ভারতের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে ইংরাজ সাক্ষাৎভাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনাদের হাতে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিয়া লইতে লাগিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রথমে কাশিমবাজারের এক ইংরাজের বণিকের কুঠীতে সামান্য একজন কর্ম্মচারী হইয়া ভারতে আসেন। ভারতে আসিবার পাথেয় তাঁহার ছিল না। একজন প্রতিবেশীর নিকট পাথয়ের টাকা ধার করিয়া তবে তিনি ভারতে আসিতে পারেন। সেই ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ পরে সেই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা রূপে পুনরায় প্রবেশ করেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ রাজস্ব-আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। মিডিলটন, ডেকার, লরেন্স ও গ্রেহাম নামক চারজন ইংরাজকে লইয়া বিখ্যাত "সার্কিট কমিটী"র প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিটীর কাজ হইল, বাঙ্গালার জমিদারদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সেই অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ করা। যাহারা নির্দ্ধারিত কর দিতে পারিবে না, তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং নূতন জমিদার সৃষ্টি করা হইবে। যে নদীয়ার মহারাজ একদিন সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করিয়া ভারতে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিও অব্যাহতি পাইলেন না। সার্কিট কমিটীর নজর সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই উপর পড়িল এবং সার্কিট কমিটী বিচার করিয়া তাঁহার রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, পরিবর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত না হইলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইবে। অবশেষে কমিটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী হইতে কাশিমবাজারকে বাহির করিয়া লয় এবং তাহা কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কান্তবাবুকে দেওয়া হয়। সার্কিট কমিটী রাণী ভবানীর রাজ্যে গিয়া



সেখানে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন ও বাহারবন্দর নামক একটী সুবিস্তৃত এবং অত্যন্ত লাভজনক জমিদারী রাণী ভবানীর জমিদারী হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইল এবং তাহাও কান্তবাবুকে দেওয়া হইল। কান্তবাবুর আসল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। সামান্য অবস্থা হইতে আপনার অসামান্য সাধুতা ও চরিত্রগুণে তিনি কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হন এবং ইনিই বিখ্যাত কাশিমবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এইভাবে রাণী ভবানী অধিকার-চ্যুত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং আপনার দত্তক-পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হাতে রাজ্যভার দিয়া তিনি পুণ্যধাম কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে

বলা প্রয়োজন যে, রাণী ভবানী রাজশাহী জেলার আমরুল-পরগণার আট গ্রামের রায় বংশের রামকৃষ্ণ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

কাশীতে গমন করিয়া রাণী ভবানী অন্তরের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ্বেশ্বরের ভূমিকে গ্রহণ করিলেন। রাণী ভবানীর দানে ও স্নেহে চির-নগরী কাশী এক নবকলেবর ধারণ করিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে তিনি একটী করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কয়বৎসর কাশীতে ছিলেন, কথিত আছে, প্রতিদিনই এইরূপ দানকার্য্য করেন। তাই মনে হয়, কাশীর প্রত্যেক শিলাখণ্ডে এই বাঙ্গালী রমণীর অন্তরের পরিচয় মূক হইয়া পড়িয়া আছে। বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা কাশীতে গিয়া কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহনার্থে প্রচুর-ভূসম্পত্তি দান করেন। কাশীর বর্ত্তমান দুর্গাবাড়ী, তৎসংলগ্ন দুর্গা-কুণ্ড নামক সরোবর, কাশীর গোপালমন্দির, তারামন্দির, দণ্ডিভোজনছত্র, মথুরাছত্র, সমস্ত রাণী-ভবানীর সৃষ্টি। ইহা ব্যতীত বহু দেবালয়, বহু অবতরণিকা কাশীতে ও বঙ্গদেশে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কাশীর পঞ্চক্রোশী তীর্থের সমস্ত পথ রাণী ভবানী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পথের দুইধারে পুণ্যকাম যাত্রীদের সূর্য্যকর হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষের সারি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সমস্ত বৃক্ষ আজ আকাশে মাথা তুলিয়া ঊর্দ্ধলোকে সেই মহীয়সী নারীর নিকট তীর্থযাত্রীদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা পৌঁছাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর অন্তরের সহিত কাশীর অন্তরকে তিনি এক অপূর্ব্ব বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন।

প্রতিবৎসর নাটোরে দুর্গাপূজা হইত। সে পূজার তুলনা আর নাই। পূজার দিন প্রতিবৎসর তিনি স্বহস্তে দুই হাজার সধবাকে বস্ত্র, শাঁখা ও সোনার নথ পরাইয়া দিতেন। দেবীপক্ষের প্রারম্ভ

হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি একশত কুমারীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত করিতেন।

কিন্তু এধারে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যাহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিবার জন্য পাঠান নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। অন্তরে, বাহিরে, চিন্তায়, ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী। রাজস্ব অনাদায়ে একে একে জমিদারী নীলামে উঠিতে লাগিল। তাঁহারই কর্ম্মচারীরা নীলামে সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল; আর তিনি যেই শোনেন যে একটী একটী জমিদারী নীলামে উঠিতেছে, অমনি তিনি কালীর সম্মুখে আনন্দে ছাগবলি দিতে থাকেন; আর বলেন, বাঁচিলাম, আর একটী বন্ধন খুলিয়া গেল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! জমিদারীর পর জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে, আর দেবীর পূজার ধূম ততই বাড়িয়া উঠে। বাহিরের বন্ধন যতই খসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের অন্তরে ততই বৈরাগ্য প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাণী ভবানী কাশী হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, "তুমি সূর্য্যবংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু চাহি না।"

সর্ব্বস্পৃহাবিগত হইয়া অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে বড়নগরে পূজা-ধ্যানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে মহারাজ রামকৃষ্ণ গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া পুণ্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তারপর একদিন মহাকালের অমোঘ নিয়মে নানাশোকতাপ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী ৭৯ বৎসর বয়সে পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র জলধারার দিকে চাহিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করেন। অর্দ্ধবঙ্গের প্রজারা সেদিন সত্যই মাতৃহারা হয়।

# জন অফ আর্ক

ফ্রান্সের অন্তর্গত ডম্‌রমী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে একজন সামান্য কৃষকের কন্যা প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে ছাগলের পাল লইয়া মাঠে চরাইতে যাইত। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণের স্পর্শে তাহার মনে হইত, আকাশ হইতে মিতালী করিবার জন্য ভগবান্ যেন এই সূর্য্যকিরণকে তাহারই নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে আপনার মনে ফুলের সহিত কথা বলিত, অবনত শাখাকে আদর করিত, পাখীর আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিত আর মনে মনে বলিত, হে আমার ভগবান্, এই সবারই মত, আমিও তোমার সৃষ্টি! আমি ধন্য!

সহসা সে শুনিতে পাইত, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে! সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া সে শুনিত, সত্যই তো তাহাকেই ডাকিতেছে! সে স্পষ্টই শুনিতে পাইত, স্বর্গের দূত আসিয়া তাহাকে বলিতেছে, 'জন, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমার কল্যাণের জন্য আমি তাঁহার আশীর্ব্বাদ আনিয়াছি। তুমি পবিত্র, তুমি ভগবানের প্রেরিত!'

দরিদ্র চাষার মেয়ে জনের সমস্ত মন দুলিয়া উঠিত। সারাদিন সে আপনার মনে ঈশ্বরের ধ্যান করিত এবং ক্রমশঃ সেই অশরীরী বাণী জন ঘন ঘন শুনিতে লাগিলেন। তাহার প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক চিন্তায় যেন কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি তাহাকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এমনি আত্ম-বিহ্বল ভাবে ফ্রান্সের এক সামান্য গ্রামে এক দরিদ্র চাষার ঘরে জনের কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ), সেই সময় ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দিন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরী আপনাকে ফ্রান্সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন. ফ্রান্সের রাজা চার্লস্ দুর্ব্বল পাত্রমিত্র সমেত একরকম পলাতক। ফ্রান্সের সৈন্যমণ্ডলী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, রাজকোষে অর্থ নাই, দেশের মধ্যে বীর্য্যবন্ত লোকও নাই।

ডম্‌রমীর মধ্য দিয়া যে সমস্ত পরাজিত ফরাসী সৈনিক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ঘরে ফিরিত, সকরুণ দৃষ্টিতে জন তাহাদের দেখিত, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইত, কেন ইহারা ক্ষতদেহে ম্লানমুখে ঘরে ফিরিবে? ফ্রান্সে কেহ কি নাই যে এই শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে পারে?

রাত্রে জন ঘুমাইতে পারিত না। আধ-জাগরণে আধ-স্বপ্নে সে দেখিত, সে যেন সৈনিকের বেশে মুক্ত-কৃপাণ-হস্তে রণক্ষেত্রে যাইতেছে, সমগ্র ফ্রান্স তাহার পশ্চাতে চলিয়াছে। কখনও সে দেখিত যে তাহার জন্মভূমি, চির-আদরের ফ্রান্স, ভিখারিণীর সাজে তাহারই নিকট আসিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে।

ক্রমশঃ ফ্রান্সের চিন্তায় জনের দিবস-নিশা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ভক্ত যেমন অহোরাত্র আরাধ্য দেবতার নাম জপ করে, জন তেমনি ফ্রান্সের নাম জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় জন একদিন দৈব-বাণী শুনিলেন, 'আমি স্বর্গের প্রধান দূত। ঈশ্বরের নিকট হইতে আমি আদেশ লইয়া আসিয়াছি। জন, তুমি তোমার দেশের রাজার নিকট যাও এবং নিজে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তুমি ফ্রান্সের গৌরবকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।'

এই দৈব-বাণী শোনার পর হইতে জন সত্যই ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মাত্র একজন দরিদ্র চাষার মেয়ে, কিশোরী, রাজনীতি অথবা যুদ্ধ-বিস্তায়

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোনও বাধা মানিলেন না, কোনও যুক্তি শুনিলেন না। ভগবান্ যখন আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনিই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবেন।

ডম্‌রমীর গৃহ-কোণ ত্যাগ করিয়া জন ফ্রান্সের পরাজিত নৃপতির সহিত দেখা করিতে চলিলেন। সকলেই উন্মাদ বলিয়া জনকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। রাজ-দশন পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট ব্যাপার, তাহার উপর এক উন্মাদকে রাজ-দর্শনে কে সহায়তা করিবে? সমগ্র ফ্রান্সের সৈন্য-মণ্ডলী যে কাজ করিতে পারিল না, এই নারী বলে কি না সেই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে পাঠাইয়াছেন!

প্রথমে জন সেই প্রদেশের ভার-প্রাপ্ত জমিদারের প্রাসাদে গেলেন। কিন্তু দ্বার-রক্ষী সৈন্যরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনদিন জন সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার অন্তরের সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইলেন। অবশেষে জমিদারের সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু তিনি এই উন্মাদকে রাজার নিকট পাঠাইতে একান্ত অনিচ্ছুক। জনও কোনও যুক্তি মানিবে না। অবশেষে তিনি জনকে রাজার নিকট পাঠাইতে সম্মত হইলেন। সেখান হইতে পুরুষের মত সর্ব্ব-অঙ্গ বর্ম্মে আবৃত করিয়া সৈনিকের বেশে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া জন ফ্রান্সের রাজার সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

বহুদিন ধরিয়া ফ্রান্সে একটা কথা চলিয়া আসিতেছিল যে, একজন নারী আসিয়া ফ্রান্সকে উদ্ধার করিবে। সেইজন্য সহসা দৈব-প্রেরিত বলিয়া জন যখন চিনোঁর রাজপ্রাসাদে চার্লসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বিস্মিত হইলেও অনেকে জনকে দেখিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিল। কিন্তু কেহই জনের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ইংরাজরা তখন অর্লিন-শহর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। খাদ্যাভাবে সেখানকার অধিবাসীরা

মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছিল। জন প্রস্তাব করিলেন যে সর্ব্বপ্রথমে আর্লিনে ইংরাজের অবরোধ বিনষ্ট করিতে হইবে। চার্লস জনের কথায় কোন মতেই আস্থা-স্থাপন কবিলেন না, কোনও কোনও সভাসদ্ বলিয়া উঠিল, "ডাইনী।"

কিন্তু জনই অবশেষে জয়ী হইলেন। জনের প্রস্তাবে চার্লস্ অবশেষে সম্মত হইলেন। জনের সর্ব্ব-দেহে একটা বিমল আভা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'স্বর্গ হইতে দূত আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, আর্লিনকে অবরোধ মুক্ত করিয়া আমি ফ্রান্সের রাজাকে যথারীতি রীম্‌সের গির্জ্জায় পুনরায় রাজমুকুট পরাইব।'



অবরুদ্ধ অধিবাসীদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া জন পুনরায় সৈন্যদল গঠন করিয়া আর্লিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জনের কথাবার্ত্তা

ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সৈন্যরা সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইল, জন সাধারণ মানবী নয়, নিশ্চয়ই সে ঈশ্বর-প্রেরিত ; নতুবা সামান্য যুবতী, যুদ্ধবিদ্যার কিছুই যে জানে না, সে এ কার্য্যে অগ্রসর হইবে কেন ?

জনের আবির্ভাবে ফরাসী-সৈন্যমণ্ডলীতে এক নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইল। বর্ম্মাবৃত দেহে বর্শাফলক হস্তে সেদিন দৈবানুগৃহীত সেই নারী ফ্রান্সে স্বদেশিকতার বীজ প্রথম বপন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, ফরাসীদের জন্য ফ্রান্স, ফ্রান্সের মাটীতে বিদেশীর পতাকা উড়িতে পারে না।

ইংরাজরা জনের কথা সমস্তই অবগত হইল, কিন্তু তাহারা প্রথমে ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু সহসা একদিন বিপুল বিক্রমে ইংরাজ-সৈন্য আক্রান্ত হইল এবং পরাজিত হইয়া আর্লিনের অবরোধ ত্যাগ করিয়া তাহাদের যখন চলিয়া যাইতে হইল, তখন তাহারা বুঝিল, দৈব-প্রেরিত হউক বা না হউক, এই নারী হইতেই তাহাদের বিপত্তি ঘটিবে।

ইংরাজ-সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হইয়া আর্লিন ত্যাগ করিল। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিজয়োল্লাসে জন চিলেনার রাজপ্রাসাদ হইতে চার্লস্‌কে লইয়া আসিয়া পুনরায় রীম্‌সের গীর্জ্জায় তাঁহার মাথায় রাজ-মুকুট পরাইয়া দিলেন। জয়োল্লাসে পুনরায় ফরাসী-সৈনিকের বুক ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই জয়োল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে চার্লসের সভাসদগণের অন্তরে এক প্রবল ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল—যে-সম্মান, যে-গর্ব্ব তাহাদের প্রাপ্য, কোথা হইতে আসিয়া এই নারী তাহা অধিকার করিয়া লইল? নিশ্চয়ই সে যাদু জানে। যাদুবলে সে সৈন্যদের সম্মোহিত করিয়া যুদ্ধ করাইয়াছে—ইহাতে তাহার নিজের কি কৃতিত্ব আছে? যাদুবলে সে চার্লস্‌কেও সম্মোহিত করিতে চলিয়াছে। এমনি ভাবে সেই ফ্রান্সের

নিষ্কলুষ চিরকুমারীর পবিত্রতার বিরুদ্ধে দুর্ব্বল-চিত্ত চার্লস্‌কে ঘিরিয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

চার্লস্‌ এবং তাঁহার সভাসদগণ যখন নিশ্চিন্ত, জনের মনে কিন্তু তখনও শান্তি ছিল না। ইংরাজ-সৈন্য তখনও প্যারি দখল করিয়া রহিয়াছে; ডিউক অফ বার্গাণ্ডি ইংরাজদের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া অন্যান্য প্রদেশকে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্ররোচনা জোগাইতেছিল; জন রাজসভায় প্রস্তাব করিলেন, এখন আলস্যে দিন অতিবাহিত করিবার সময় নাই—এখনি প্যারিতে অভিযান করিয়া সেখান হইতে শত্রু-সৈন্যদের বিতাড়িত করিতে হইবে।

জনের এই নূতন সমরায়োজনে বিলাস-মগ্ন সভাসদগণ প্রমাদ গণিলেন। যাহাতে জন কৃতকার্য্য না হন, তাহার জন্য তাঁহারা চার্লস্‌কে নিয়ত বুঝাইতে লাগিল যে, এই নারীর যাদুমন্ত্রে ভুলিলে ফ্রান্স সর্ব্বস্বান্ত হইবে। দুর্ব্বলচিত্ত অকর্ম্মণ্য চার্লস্‌ও সভাসদগণের কথায় সায় দিলেন। কিন্তু জন তাঁহার অন্তরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবশেষে চার্লস্‌কে রাজী করাইলেন এবং ১৪২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিস পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধে জন সহসা বাণবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। জনকে আহত হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া ফরাসী-সৈন্যরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং যে যাহার পালাইতে লাগিল। কারণ, তাহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জনের দেহে কোনও মানুষের আঘাত লাগিতে পারে না, কারণ সে দৈব-রক্ষিত। কিন্তু যখন সত্যসত্যই তাহারা দেখিল যে, জন সামান্য একটী বাণ-বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইল, তখন তাহারা একদিকে যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, অন্যদিকে জনের উপর রাগিয়া গেল। এতদিন জন যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের

ধারণা হইল যে, তাহাদের ভুলাইবার জন্যই সে সেই সব বলিয়াছে। আর নিশ্চয়ই সে কোথা হইতে যাদু-বিদ্যা শিখিয়াছিল, যাহার ফলে তাহাদের এমনি সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। জনকে মিথ্যা ডাইনী বলিয়া সকলে গালাগাল দিতে লাগিল।

কয়েকজন একান্ত অনুরক্ত বন্ধুদের লইয়া জন নীরবে এই সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন। তারপর একদিন সেই কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া তিনি ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতক ডিউক অফ বার্গাণ্ডীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে অন্ধকার রাত্রে বার্গাণ্ডীর লোক দ্বারা তিনি সহসা আক্রান্ত হইলেন। অন্ধকারে তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু সংখ্যাল্প বলিয়া বেশীক্ষণ জনের দল যুঝিতে পারিল না। বার্গাণ্ডীর দলের একজন লোক অতর্কিতে আসিয়া জনকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডিউক অফ বার্গাণ্ডীর নিকট লইয়া গেল।

জনকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে—ইংরাজদের পক্ষ হইতে সেইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ডিউক অফ বার্গাণ্ডী অর্থ-মূল্যে এবং বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধার সর্ত্তে সেদিন স্বদেশের ত্রাণকর্ত্তা জনকে ইংরাজদের হাতে বিক্রয় করেন।

বন্দী অবস্থায় জন এক কারাগার হইতে আর এক কারাগারে প্রেরিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ফ্রান্সের রাজা—একদিন যাহার মাথায় জন রাজমুকুট তুলিয়া দিয়াছিলেন, জনের কারামুক্তির জন্য কোনও চেষ্টা করিল না।

অবশেষে ইংরাজরা জনকে বন্দী অবস্থায় ইংরাজ-অধিকৃত রুয়ে প্রদেশে লইয়া আসিলেন। সেইখানে সমস্ত অনুষ্ঠানকে বজায় রাখিয়া জনের বিচারসভা বসিল। জনের অপরাধ সে ডাইনী, যাদুমন্ত্র জানে। জন যে ডাইনী সে বিষয়ে সকলেই একমত হইলেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা

হইল যে, প্রকাশ্য স্থলে জনকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইবে।

১৪৩১ সালের ৩০শে মে রুয়ের বাজারে জনকে ডাইনী বলিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ফ্রান্স সেদিন ইহার একটুও প্রতিবাদ করে নাই।

প্রায় চারশো বছর পরে ১৯২০ সালের ১৬ই মে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ফ্রান্সের ধর্ম্মযাজকগণ সেদিন ডাইনী জনকে ফ্রান্সের গির্জ্জার একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন.

সেদিনকার 'ডাইনী' জন আজ ফ্রান্সের সেণ্ট জন।

# ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

যতদিন মানুষ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি না পাইবে, যতদিন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া মানব দেবতাদের মতন অজর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই মহিয়সী নারীর নাম ব্যাধি-বেদনা-ক্লিষ্ট মর্ত্ত্য মানব চিরকৃতজ্ঞতায় স্মরণ করিবে। নারীর অন্তরের স্বাভাবিক সেবা-ধর্ম্মকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে জগতের ব্যাধিগ্রস্ত লোকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিবার প্রথম পন্থা ও আদর্শ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তাঁহারই আদর্শ ও পন্থা অনুসরণ করিয়া আজ জগতের সর্ব্বত্র হাসপাতালে হাসপাতালে শ্বেতবসনা নার্সগণ জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী-নির্ব্বিচারে অম্লান-বদনে রোগ ও রোগীর সেবা করিয়া চলিয়াছেন।

ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে এক প্রবাসী ইংরাজ-পরিবারে ১৮২০ সালের মে মাসে কুমারী নাইটিঙ্গেল জন্মগ্রহণ করেন। ফ্লোরেন্স নগরে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কন্যার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রাখা হয়। কন্যার জন্মগ্রহণের পরই উক্ত পরিবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

শৈশবে পুতুল লইয়া খেলা করিতে করিতে যখনই কোনও পুতুলের অসুখ হইত, শিশু নাইটিঙ্গেল আহার নিদ্রা ভুলিয়া পুতুলের সে. করিত। পাছে অসুস্থ পুতুলের নিদ্রাভঙ্গ হয় সেইজন্য নিকটে কাহাকেও যাইতে দিত না।

বালিকা-বয়সে একদিন নাইটিঙ্গেল বেড়াইতে বেড়াইতে দেখে, তাহাদের পরিচিত মেষ-পালক কোনও মতে মেষগুলিকে একত্র করিতে পারিতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার "কুকুরটী আজ কোথায় ?"

মেষ-পালক দুঃখিত হইয়া উত্তর দিল, "পা ভাঙ্গিয়া সে অসুস্থ হইয়া ঘরে পড়িয়া আছে !

কুকুরটী নাইটিঙ্গেলের বড়ই প্রিয় ছিল। কোনও কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ বালিকা মেষ-পালকের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া যেখানে কুকুরটী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইল। স্বহস্তে যায়গাটী পরিষ্কার করিয়া মেষ-পালককে গরমজল করিতে বলিল। বাড়ীতে খবর পাঠাইল যে, কুকুরটী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সে আজ রাত্রে মেষ-পালকের বাড়ীতেই থাকিবে।

সারারাত্রি বসিয়া কুকুরটীর পায়ে গরম জলের সেক দিল। আরাম হইতে কুকুরটী স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে শত শত আর্ত্তলোক এইরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তাঁহার নিকট অন্তরের অনাবিল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে।

কুমারী নাইটিঙ্গেল ইংলণ্ডের অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার বিলাসের আবহাওয়া তাঁহার মনে কোনও

রেখাপাত করিতে পারে নাই। তিনি যতই প্রাপ্ত-বয়স্কা হইতে লাগিলেন, ততই আর্ত্তরোগীদের সেবায় কি ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিযুক্ত করা যায়, তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। নিজের অন্তরের বাসনা পিতাকে জানাইয়া তিনি ডাক্তারী ও পরিচর্য্যা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় ইংলণ্ডে আর একজন মহিয়সী নারী জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম এলিজাবেথ ফ্রাই। জগতের কারা-সংস্কার ব্যাপারে মিসেস্ ফ্রাই তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন এবং য়ুরোপের কারাগারে কারাগারে পরি-ভ্রমণ করিয়া, সেখানকার ভয়াবহ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এক পৃথিবী-ব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।



কুমারী নাইটিঙ্গেল যখন উপযুক্ত পন্থার অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত সৌভাগ্যক্রমে এলিজাবেথ ফ্রাইএর সাক্ষাৎ হয় এবং নাইটিঙ্গেলের অন্তরের মহৎ বাসনার কথা শুনিয়া উক্তবিদ্যা বিশেষ ভাবে শিখিবার জন্য ফ্রাই তাঁহাকে জার্ম্মাণীতে যাইতে উপদেশ দেন। কারণ, তখন জার্ম্মাণীর কাইসারবার্থ নগরে প্যাষ্টর ফ্লিভনার নামক জার্ম্মাণ ডাক্তার পরিচর্য্যা-বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নাইটিঙ্গেল কালবিলম্ব না করিয়া কাইসারবার্থের কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মাণীর সেই সময়কার হাসপাতালের ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই সময় ক্রিমিয়ায় ইংলণ্ডের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ হইতেছিল। ইংরাজ-পক্ষে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়ে, উপযুক্ত শুশ্রূষার অভাবে তাহারাও মরিতে লাগিল; প্রতিদিনই হতভাগ্য আহতদের অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের সম্মান রক্ষার জন্য যাহারা আহত হইয়া পড়িল, মৃত্যু ব্যতীত তাহাদের দেখিবার আর কেহ রহিল না।

সেই ভয়াবহ অবস্থায় প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্য ইংলণ্ডে আবেদন আসিতে লাগিল। কিন্তু সেই মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে কে যাইবে সেবার অমৃত-প্রলেপ লইয়া? সে রকম পুরুষই বা কই? আর পুরুষেরা যদি সেবা করিবে, যুদ্ধ করিবে কাহারা? সেই সময় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অন্তর সাড়া দিয়া উঠিল। এই তো সময় আসিয়াছে, এতদিন ধরিয়া যে ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনের। তিনি সামরিক বিভাগে এই কার্য্যের ভার লইবার

জন্য আবেদন করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়াই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন 'নার্স' লইয়া আহতদের সেবার জন্য মৃত্যুর লীলা-ক্ষেত্রের মধ্যে যাত্রা করিলেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল রণক্ষেত্রের নিকটস্থ স্কুটারীর আহত-সেনাদের ব্যারাকে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। লোকে মাল-গুদামে যে ভাবে জিনিষ-পত্তর রাখে, সেই ভাবে আহত মানুষরা পঁড়িয়া আছে। চারিদিকে ময়লা, গণ্ডগোল, চিকিৎসার কোন নিয়ম নাই, সে অবস্থায় কোন নিয়ম পালন করাই অসম্ভব। চতুর্দ্দিকে অনবরত ব্যথিত আর্ত্ত মানবের অসহায় চীৎকার ধ্বনি! কেহ নাই যে সান্ত্বনা দেয়, কেহ নাই যে একটু শুশ্রূষা করে। যাহারা একটু বেশী ভাবে আহত হইত, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। দুরারোগ্য বলিয়া ডাক্তারগণ তাহাদের আলাদা করিয়া রাখিতেন। রোগীর পথ্য বা শুশ্রূষার জন্য যে সমস্ত জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও অনেক সময় পাওয়া যাইত না। সবার উপর ছিল সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য। তাঁহারা সম্মুখের সমর লইয়া এত বিব্রত যে পশ্চাতের আহতদের দেখিবার তাঁহাদের সময় ছিল না। অথচ হুজুরদের হুকুম না হইলে এক টুকরো রুটীও পাওয়ার উপায় ছিল না; অথচ সেই হুকুমটুকু সংগ্রহ করিতে করিতে হয়ত ওধারে রোগী খাবার প্রয়োজনের হাত এড়াইয়া যাইত। অসহায় আহত সৈনিকগণ শুধু যন্ত্রণায় চীৎকার করিত আর নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিত।

এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে, মৃত্যুর সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে, সর্ব্ব-অঙ্গে সান্ত্বনার অমৃত-আশ্বাস লইয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল তাঁহার জীবনের মহাকর্ত্তব্যকে সানন্দে বরণ করিয়া লইলেন।

তাঁহার প্রথম কাজ হইল, সেই স্থানের জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া

রোগীসেবার উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। দিবারাত্র অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া তিনি সমস্ত জিনিষে শৃঙ্খলা আনিলেন। যেখানে শত লোকের আর্ত্তনাদ কেহ শ্রবণ করিত না, সেখানে এমনি শান্ত নীরবতার সৃষ্টি হইল যে, পাশ ফিরিতে কোনও আহত লোক সামান্য শব্দ করিলে তাহা বাজিয়া উঠিত। যেখানে কাহাকেও ডাকিয়া না পাইয়া অসহায় সৈনিককে অবশেষে হয় মৃত্যুর, নয় সৃষ্টির দেবতাকে ডাকিতে হইত, সেখানে সামান্য ইঙ্গিত করিতেই শুভ্র-বসনা 'মমতাময়ী নারী আসিয়া দাঁড়াইত, শুশ্রূষা করিত, ব্যথায় প্রলেপ দিত।

নিশীথে কুমারী নাইটিঙ্গেল অধিকাংশ সময় ঘুমাইতেন না। কোথায় কাহার প্রয়োজন, কেহ যদি সাড়া না দেয়। তাই প্রতি নিশীথে দীপ-হস্তে প্রত্যেক রোগীর শিয়রে স্বর্গের দেবতার মত এই নারী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। প্রত্যেকের সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয়, কাহারও স্ত্রী পত্র লিখিয়াছে, পড়িয়া শুনাইতেছেন; কাহারও বা উত্তর লেখা প্রয়োজন, স্বহস্তে লিখিয়া দিতেছেন, কেহ বা প্রবাসের ব্যথায় ক্লিষ্ট, তাহার বিষণ্ণ অধরে, শুষ্ক-অন্তরে কথায় কথায় হাসির রেখা ফুটাইতেছেন। সেই মৃত্যুর মধ্যে, দীপ-হস্তে এই নারীর আবির্ভাব স্বর্গের কল্যাণ-দূতীর মত সকলের অন্তরে এক অভিনব আশ্বাস আনিয়া দিল। নিশীথে রোগীর শিয়রের নিকট দিয়া দীপ-হস্তে যখন তিনি নিঃশব্দ পদচারণে বেড়াইতেন, তখন কৃতজ্ঞ আহত সৈনিকগণ তাঁহার ছায়া চুম্বন করিত। তাঁহার ছায়া শয্যায় আসিয়া পড়িলে, তাহারা আপনাদের বেদনা ভুলিয়া যাইত। যন্ত্রণায় যখন তাহারা কুৎসিত অভিশাপ বর্ষণ করিত, তখন সহসা এই নারীর দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, সেই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তাহারা আর কুৎসিত কথা বলিতে পারিত না, অভিশাপের ভাষা প্রার্থনার বাণীতে সুন্দর হইয়া উঠিত।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সীমানা ছাড়াইয়া এই মমতাময়ী নারীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা তখন ইংলণ্ডে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সমগ্র জাতির জননীরূপে ইংলণ্ডের নর-নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। শেষ-আহত সৈন্যটী যতক্ষণ না পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কুমারী নাইটিঙ্গেল সেখানেই রহিলেন। তারপর যেদিন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইংলণ্ড তাঁহাকে বিপুল গৌরবে অভিনন্দিত করিল। তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য নানা প্রকারের আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত সম্মান প্রত্যাখান করিতে লাগিলেন। অর্থ, সম্মান, পদবী, প্রশংসা লইয়া ইংলণ্ডের সরকার ও জন-সাধারণ তাঁহাকে আহ্বান করিল, কিন্তু তিনি তাহার কোনটাই গ্রহণ করিলেন না। আপনার অনাড়ম্বর জীবনের নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অনাগত মানবদের জন্য কি ভাবে একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায়, যাহাতে রোগী যেন না ভাবিতে পারে, এই কোটী কোটী মানবের মধ্যে সে অসহায়।

অবশেষে সরকার হইতে পদবী লইবার জন্য যখন পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, মাত্র একটী উপায়ে আমি জাতির নিকট হইতে সম্মান গ্রহণ করিতে পারি—লণ্ডনে একটী হাসপাতাল ও নার্সদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেই আমি আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করিব এবং আমি এই জন্যই জাতির নিকট হইতে সাহায্য চাই।

এই আবেদনের ফলে অবিলম্বে চারিদিক হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং ১৮৭১ সালে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নার্স-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নাইটিঙ্গেল-হোম ও সেণ্ট টমাস হাসপাতাল লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইল।

নারী-জীবনের সর্ব্বসুখ ও সৌভাগ্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল তাঁহার অবশিষ্ট সমস্ত জীবন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইল। বহু রাজা তাঁহাকে সম্মানসূচক পদবী পাঠাইলেন। তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে একটি বহুমূল্য হীরকের ব্রেসলেট উপহার দেন। জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইতালী প্রত্যেক জাতির গভর্ণমেণ্ট সম্মানসূচক রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করিল। তিনিই প্রথম-নারী যিনি ইংলণ্ডের "অর্ডার অব মেরিট" নামক রাজকীয় সম্মান পান।

১৯১০ সালে সেবাকর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এই নারী যখন পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার পারলৌকিক প্রার্থনার জন্য ইংলণ্ডের সেণ্ট পল গির্জ্জায় যে সম্মিলনী হয়, তাহাতে রাজা রাজপরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের বংশধর পর্য্যন্ত সকলে উপস্থিত হন এবং রাজা-প্রজা, ধনী নির্ধন সকলের সম্মলিত প্রার্থনার সুর সেদিন এই নারীর আত্মার কল্যাণের জন্য উর্দ্ধলোকের দিকে সমুত্থিত হয়।

ইতিহাসের শতকীর্ত্তি-বিজড়িত যে ফ্লোরেন্স নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানকার প্রধান গির্জ্জায়, তাঁহার একটী মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, দীপহস্তে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, নয়নে করুণার অমৃত-দৃষ্টি, দৃষ্টিতে নিখিল আর্ত্ত-ব্যথিতের অমৃত-প্রলেপ মিশান।

# এলিজাবেথ ফ্রাই

আজকাল যে কেহই খবরের কাগজ পড়েন, তিনিই অবগত আছেন যে, কারাগারে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বন্দীরা প্রায়োপবেশন করেন। কিন্তু আজ যে সমস্ত কারণে বন্দীরা প্রায়োপবেশন করেন, ব্যক্তিগত কারণ ব্যতীত, অনেক সময় সেই সমস্ত কারণের সহিত পূর্ব্বেকার কারাগারের ব্যবস্থা তুলনা করিলে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। গত শতাব্দীর কারাজীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তখন অপরাধের শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও অপরাধীর কোনও শ্রেণী-



বিভাগ ছিল না। রাজদণ্ডে দণ্ডিত যে কোনও অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি, যে-মুহূর্ত্তে কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করার সমস্ত অধিকার কারাপ্রাচীরের বাহিরে রাখিয়া আসিতে হইত। কারাগারের অভ্যন্তরে যে নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ জীবন যাপন করিতে তাহাকে বাধ্য করান হইত এবং সেখানে নিত্য যে সমস্ত ঘটনা ঘটিত, তাহাতে প্রত্যেক অপরাধী যে-টুকু মনুষ্যত্ব সঙ্গে লইয়া আসিত, তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া যাইত। কারামুক্তির পর কারাগারের পাপ তাহার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া পুনরায় তাহাকে আরও ঘোরতর অপরাধী করিয়া তুলিত। এইভাবে কত লোক, যাহারা কোনও ভুল-ক্রমে হয়ত জীবনে একবার পদ-স্খলিত হইয়াছে, হয়ত বা যাহারা অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হইয়াছে, হয়ত যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের অথবা মহত্ত্বের বীজ যে-কোনও উল্লেখযোগ্য মানুষের মত সমানই ছিল, তাহারাও এই কারাগারের পাপজীবনের স্পর্শে আপনাদের আত্মাকে কলুষিত করিতে বাধ্য হইয়াছে ; কারাগার অপরাধীর সংশোধনাগার না হইয়া, বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে অপরাধীর স্রষ্টা হইত। আজ জগতের সমস্ত সভ্যদেশে যে কারাসংস্কার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং সভ্যতা ও কারাগারের নারকীয় জীবন ও অযথা মনুষ্যত্ব-নিপীড়ন একসঙ্গে চলিতে পারে না, এই আদর্শের জন্য জগৎ মহিয়সী ইংরাজ-মহিলা এলিজাবেথ ফ্রাইএর নিকট চির-কৃতজ্ঞ। অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়া মনুষ্যত্বকে হত্যা করার মহা-অপরাধ হইতে এই নারী বর্ত্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করিয়াছেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২১শে মে ইংলণ্ডের নরউইচ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত আর্লহাম নগরে এলিজাবেথ ফ্রাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন গর্নী, মাতার নাম দানিয়েল বেল।

এলিজাবেথ অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাঁহার কৈশোর-স্বপ্ন অতিবাহিত হইবার কথা, কিন্তু কিশোরীর চিত্তে সামাজিক জীবনের বিলাস-স্বপ্ন কোনও প্রেরণা জোগাইত না। ধর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ব্যভিচার দূর করিবার জন্য সেই সময়ে "কোয়েকার" দল তাঁহাদের আদর্শ চারিদিকে প্রচার করিতেছিলেন। এলিজাবেথ ফ্রাই প্রথম যৌবনে এই কোয়েকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁহার জীবন-গঠনে উইলিয়ম সাভেরী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ সহায়তা করেন। তিনিই এই কিশোরীর চিত্তকে জগতের অনায়াস-লব্ধ সহজ সুখের প্রলোভন হইতে দুষ্কর আদর্শময় জীবন-যাপনের দিকে টানিয়া আনেন। ভোজসভায় নাচিতে গিয়া কিশোরীর নৃত্যের তাল কাটিয়া যায়, মনে হয় কোথাও কোন্ অন্ধকার ঘরে অনাহারে মানুষ কাঁদিতেছে। সঙ্গীত গাহিতে গিয়া সুর কণ্ঠে আটকাইয়া যায়, মনে হয় কোথাও কোন্ নিরানন্দ অন্ধকারে মানুষের সমস্ত বিকাশ নিরুদ্ধ হইয়া বিকৃত বীভৎস চীৎকার উঠিতেছে। সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যময় জীবনের সমস্ত রূপ-বিলাস এলিজাবেথের নিকট তিক্ত হইয়া উঠিল।

তিনি নগরীর দরিদ্র-পল্লীর মধ্যে পীড়িত, আর্ত্ত, দরিদ্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এই সময়ে জোসেফ ফ্রাই নামক একজন বিশিষ্ট কোয়েকারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং এই মিলনের ফলে এলিজাবেথ আরও গভীরভাবে সমাজ-পরিত্যক্ত দরিদ্রদের মধ্যে তাঁহার প্রচার ও সেবা কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাড়ী যত দরিদ্র, নিরন্ন, নিরক্ষর, আতুর লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল। কাহাকেও অর্থ দিয়া, কাহাকেও ঔষধ দিয়া, কাহাকেও উপদেশ দিয়া, কাহারও বা বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়া, মিসেস্ ফ্রাই দরিদ্র আতুরদের জননী হইয়া উঠিলেন।

সেই সময় ইংলণ্ডের কারা-ব্যবস্থা অত্যন্ত কদর্য্য ছিল। একদিন ১৮১৩ সালে নিউগেটের কারাগারে গিয়া তিনি প্রত্যক্ষভাবে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের নূতন পথ সেই দিন হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। তিনি কারাগারের সেই জঘন্য জীবন দূর করিবার জন্য সেই দিন হইতে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সেই সময় কারাগারে নারী, অপরাধীদের জন্য কোনও পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না। জঘন্য দাগী বদমায়েসদের সঙ্গে তাহাঁদের রাখা হইত এবং তাহার ফলে এই সমস্ত নারী কারাজীবন হইতে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লইয়া পুনরায় সমাজে আসিত, তাহাতে সমাজই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। সেই কারাগারের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে নারীরা সন্তানবতী হইত, অনেককে শিশুপুত্র লইয়া জেলে যাইতে হইত এবং সেই সমস্ত শিশুরাও পাপ-স্পর্শে কলঙ্কিত হইয়া উঠিত।

এলিজাবেথ ফ্রাই কারাগারে গিয়া সেখানে সুন্দরতর বৃহত্তর জীবনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত কারাবাসী এই নারীর আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ হইয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। কারাকর্ত্তৃপক্ষদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কারাজীবনে একটা শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি আনিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সেই অনুসারে কারাবন্দীদের জীবন-যাত্রার নূতন প্রণালী গঠিত হইল।

নিউগেট কারাগারে এলিজাবেথ ফ্রাই যখন সাক্ষাৎ ভাবে এই সমস্ত সংস্কার-কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময় ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় জেল-ব্যবস্থা-সংস্কার ও নারী-অপরাধীদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থার জন্যও তিনি বিপুলভাবে প্রচার কার্য্য করেন। তাহার ফলে ১৮১৮ সালে পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্স্ কর্ত্তৃক জেল-ব্যবস্থা-তদন্তের জন্য একটা কমিটী গঠিত হয় এবং এই কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য এলিজাবেথ ফ্রাইকে

আহ্বান করা হয়। এই নারীর সাক্ষ্য ও আবেদনের ফলে পার্লামেণ্ট হইতে আইন করিয়া কারাগারে নারীদের পৃথক্ ব্যবস্থা হইল।

এলিজাবেথ ফ্রাইএর নাম তখন ইংলণ্ডের সকলের মুখে। স্বয়ং ইংলণ্ডের রাণী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করিলেন।

কারাগার হইতে তাঁহার দৃষ্টি আর একটী বিষয়ে পতিত হইল। সেই সময় লণ্ডনে শত শত দরিদ্র গৃহহীন ব্যক্তি আশ্রয়-অভাবে সেই নিদারুণ শীতে জীর্ণবস্ত্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত গৃহ-হীন ব্যক্তিদের তুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করা যায় না এবং এমনি বিচিত্র যে জগতের শ্রেষ্ঠ নগরীতেই দরিদ্র গৃহহীন লোকেদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং আজও আছে।

একদিন শীত-প্রভাতে পরিভ্রমণে বাহির হইয়া এলিজাবেথ ফ্রাই দেখেন যে, একটী বালক একজনের বাড়ীর দরজায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার সর্ব্ব-অঙ্গে বরফ জমিয়া গিয়াছে। কাছে গিয়া দেখেন, বালক চির-নিদ্রায় মগ্ন। রাত্রে কোনও আশ্রয় না পাইয়া, অনাথ বালক হয়ত গৃহস্থের দ্বারে আশ্রয়ের জন্য করাঘাত করিয়াছিল। কেহই সাড়া দেয় নাই। দরজার ভিতরে মানুষ পরমানন্দে ঘুমাইতেছে—দরজার বাহিরে বালক সেই নিদারুণ শীতের মৃত্যু-হিম-স্পর্শে-চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তখন লণ্ডনে এইরূপ ঘটনা নিত্যই হইত।

সেই শোচনীয় ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া এলিজাবেথ গৃহ-হীন ভাগ্য-হতদের রাত্রিবাসের ব্যবহার জন্য তুমুল আন্দোলন-সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে রাত্রি-বাস প্রতিষ্ঠা হইল। অভুক্ত থাকিলে সেখানে রাত্রের মত আহারও মিলিত এবং যে সমস্ত লোক বেকার অবস্থায় রাত্রে এই সমস্ত আড্ডায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইত, যাহাতে তাহারা কোথাও চাকরী পায়, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইল।

নানাবিধ সামাজিক কার্য্যের মধ্যে ফ্রাই কিন্তু তাঁহার জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও উদাসীন থাকিতেন না। কারারুদ্ধ নারীদের জন্য কারাগারের মধ্যে নানাবিধ কাজের ব্যবস্থা করা হইল। সেই সময় বোটানী উপসাগরের মধ্যে এক নির্জ্জন দ্বীপে গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের নির্ব্বাসিত করিয়া রাখা হইত। নিদারুণ শীতেও তাহারা গাত্র-বস্ত্র পাইত না। নিউগেট কারাগারে নারীরা যে সমস্ত বস্ত্র তৈয়ারী করিতে লাগিল, তাহাই বোটানী উপসাগরের মধ্যে দ্বীপান্তরিতদের পাঠান হইতে লাগিল। কারারুদ্ধরাও ক্রমশঃ বুঝিতে লাগিল, সমাজ তাহাদের উপর প্রতিহিংসা লইতে চায় না, চায় তাহাদের সংস্কার।

ক্রমশঃ ইংলণ্ড ছাড়াইয়া ফ্রাইএর নাম য়ুরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেক দেশের শাসন-তন্ত্র স্ব স্ব কারাব্যবস্থার দিকে নজর দিতে লাগিলেন। তখন হত্যা করা দূরে যাক, যে-কোনও অপরাধে ফাঁসী হইতে পারিত এবং লঘু অপরাধের জন্য তখন প্রত্যহই কোনও না কোন মেয়েকে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের শেষ অংশ অভিনয় করিতে হইত। ইংলণ্ডের বহুলোক প্রাণদণ্ডের এই কঠোর ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার জন্য যে আন্দোলন করেন, ফ্রাই তাহাতে যোগদান করেন এবং তাঁহাদের প্রচারের ফলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়া না যাইলেও, লঘু অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল। আজও য়ুরোপে প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা একেবারে তুলিয়া দিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন হইতেছে।

যে-মুহূর্ত্তে মানুষ কোনও সামাজিক অথবা নৈতিক বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সে পশু হইয়া যায় না। মানুষ পশু হইয়া গেলেও, সমাজের কর্ত্তব্য তাহাকে পুনরায় মনুষ্যত্বের সীমার মধ্যে লইয়া আসা। তাহারই জন্য শাসন এবং এই শাসনের সহিত কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা প্রতিহিংসা থাকা উচিত নয়। সংস্কারই

শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। আইন যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, তবে সংস্কার অসম্ভব। অপরাধীকে পশু ধরিয়া লইয়া পশুর মতন শাসন করিলে, আইনের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইবে, এই কথাই এলিজাবেথ ফ্রাই তাঁহার জীবন দিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।

সেই সময় যে-সমস্ত বন্দী কারাগারে কোনও অন্যায় ব্যবহার করিত, শাস্তি-স্বরূপ তাহাদের জাহাজে করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার নূতন উপনিবেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত জাহাজকে convict-ship বলা হইত। ছাগল-গরু-ভেড়াকে যে ভাবে চালান দেওয়া হয়, ঠিক সেই রকমভাবে স্ত্রীপুরুষশিশুনির্ব্বিচারে সকলকে চালান দেওয়া হইত। আর অষ্ট্রেলিয়ায় তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে সেখানকার শাসনকর্ত্তার দয়ার উপর নির্ভর করিত।

টেমস্ নদীর উপর রাত্রিকালে এই সমস্ত জাহাজ বোঝাই করা হইত এবং প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িত। এলিজাবেথের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইল এবং তিনি রাত্রিকালে এই সমস্ত জাহাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে দেখিলেন এবং যাহাতে তাহারা সাধারণ মানুষের সুবিধা পায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া যাহাতে কোনও কাজের বন্দোবস্ত হয়, তাহার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং ক্রমশঃ সেই সমস্ত ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। সেই দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার এক-ঘেয়েমীর হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য জাহাজেই তাহাদের ছোট খাটো কাজেরও বন্দোবস্ত করা হইল। পাপী বুঝিল, সে পরিত্যক্ত নয়, এখনও সে বৃহৎ মনুষ্যসমাজের অংশ ; হয়ত একদিন আবার সে সহজ মানুষের মত ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া মানুষের সমাজে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

ফ্রাই ইংলণ্ডের সমস্ত প্রাদেশিক কারাগার ঘুরিয়া প্রত্যক্ষভাবে

তাহাদের বিধিব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় য়ুরোপের নানা দেশ হইতে তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল। ফ্রান্সের রাজা ও রাণীর আহ্বানে তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন এবং কি ভাবে কারাসংস্কার সংশোধন করা যায়, তাহা লইয়া সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত আলোচনা করিলেন।

ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া এলিজাবেথ য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের কারাগারে ঘুরিয়া, বিভিন্ন দেশের শাসকদের সহিত আলোচনা করিয়া সর্ব্বত্র কারা-সংস্কারের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। সমগ্র য়ুরোপে এই অসামান্যা নারীর উদার বাণী আইনের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় যোজনা করিল। কারাগারের গভীর অন্ধকারেও মানবতার মঙ্গল-দীপের আভা গিয়া পড়িল। দেশে দেশে,' ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে, বেলজিয়ামে, স্বয়ং শাসনকর্ত্তারা এলিজাবেথকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছেন এবং না ডাকিতেও য়ুরোপের কারাগারে কারাগারে বন্দীদের মধ্যে গিয়া কল্যাণীর রূপে তিনি দাঁড়াইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, কোথাও মানুষ আপনার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য হত্যাকারীদের সঙ্গে হত্যাকারীদের মত শাস্তি ভোগ করিতেছে, কোথাও বা নিষ্কলুষ মানুষ বিচারের ভুলে আজীবন কারার অন্ধকারে জীবন কাটাইতেছে।

এলিজাবেথ ফ্রাই বিশ্রাম কাহাকে বলে জানিতেন না। চার বার তিনি ইংলণ্ড হইতে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যান এবং সেখানকার বিভিন্ন কারাগার পরিভ্রমণ করেন্। ইহার ফলে তাঁহার শরীর একদম ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শেষদিন আগাইয়া আসিতেছে। অনাগত মানব যাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে প্রেরণা ও পন্থার নির্দ্দেশ পাইতে পারে, সেইজন্য তিনি তাঁহার দেখা সমস্ত জিনিষ লিপিবদ্ধ করিতে বসিলেন। কিন্তু শরীরে তাহা আর সহ্য হইল না।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর এলিজাবেথ ফ্রাই পরলোক গমন করিলেন।

কিন্তু এই কল্যাণী নারী পাপের দুর্গম অন্ধকারে মানবতার যে মঙ্গল দীপশিখা জ্বালাইয়া গিয়াছেন, তাহার জ্যোতি আজ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

# ম্যাদাম কুরী

বৈজ্ঞানিক জগতে অভিনব আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ সালে ম্যাদাম কুরী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১১ সালে পুনরায় বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে সেই নোবেল পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হয়। এ পর্য্যন্ত নোবেল পুরস্কার জীবনে দুইবার পাইবার সৌভাগ্য এক ম্যাদাম কুরী ব্যতীত আর কাহারও ঘটে নাই।

বৈজ্ঞানিক জগতে নারীর বিশেষ কোনও স্থান ছিল না বলিলেই হয়। দুই একজন বৈজ্ঞানিক নারীর নাম শোনা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব দান এত সামান্য ছিল যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সুবিপুল ক্ষেত্রে তাহা সাধারণতঃ দৃষ্টি-গোচর হইত না।

কিন্তু ম্যাদাম কুরী আসিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নারীর গৌরবের সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজ ম্যাদাম কুরী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম। তাঁহার আবিষ্কার জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

অনেকের ধারণা যে ম্যাদাম কুরী ফরাসী-রমণী; কিন্তু সে ধারণা

ভুল। তিনি পোলাণ্ডের মেয়ে । ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স নগরে এক ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম ছিল মেরী শ্ক্লো...

মেরীর বাবা লাডিস্লাস্ শ উস্কা ছিলেন একজন বিখ্যাত রাসায়নিক। ছেলেবেলায় খেলাং পুতুল লইয়া শিশুদের দিন কাটে। কিন্তু মেরীর দিন কাটিত পিতার লেবরেটারীতে। সেইখানে সেই সমস্ত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখিয়া, তাহা লইয়া খেলা করিবার জন্য শিশুর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আপনার মনে মেরী বালিকা-বয়সে ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি লইয়া পিতার অনুকরণে নানাপ্রকারের অদ্ভুত প্রক্রিয়া দ্বারা নানাবিধ শিশু-সুলভ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মানসিক প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া পিতা মেরীকে সেই রকম লেখা-পড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, মেরী এত শীঘ্র আগাইয়া চলিলেন যে, কিশোরী অবস্থাতেই তিনি পিতার সাহায্যকারী রূপে তাঁহার ল্যাবরেটারীতে হাতে কলমে কাজ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবে ল্যাবরেটারীর মূর্ত্তি বদলাইয়া গেল। তরুণ-ছাত্ররা এক নব-উদ্দীপনা পাইল। মেরীর আগ্রহ সকলের অন্তরে এক অভিনব প্রেরণা আনিয়া দিল। সবাই মেরীকে আদর করিয়া "মিস্ প্রফেসার" বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

লেবরেটারীর বাহিরে তখন পোলাণ্ডের রাজনৈতিক জগতে এক তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। পোলাণ্ড তখন রুষিয়ার অধীন। সেই অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য পোলাণ্ডে বিরাট স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছিল। সে আন্দোলনের ঢেউ রাসায়নিকের ল্যাবরেটারীতে আসিয়া লাগিল। অধ্যাপক গোপনে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিলেন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে কন্যাও সেই বিপ্লবী দলে যোগদান করিল

এবং কিশোর-হৃদয়ের প্রথ-, উন্মাদনায় মেরী যন্ত্রপাতি ভুলিয়া কিছুদিনের মত বিপ্লব-আন্দোলনে একেবারে ডুবিয়া গেলেন।

গুপ্তচরেরা যথাসময়ে খবর পাইল যে একটি তরুণী বিপ্লবীদলে প্রেরণা জোগাই তেছে এবং তাহাব বিধিমত ব্যবস্থা করিবার জন্যও তাহারা সজাগ হইয়া উঠিল। মেরী বুঝিলেন যে আর অধিক দিন ওয়ারসতে অবস্থান করিলে, চির-জীবন হয়ত কারাগারেই কাটাইতে হইবে। একদিন গোপনে ছদ্মবেশে মেরী ওয়ার্স নগর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পোলাণ্ডের ক্রাকাউ শহরে পালাইয়া আসিলেন।

ক্রাকাউ শহরে অবস্থান-কালে দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। সেই সময় তিনি খবর পাইলেন যে, এক রুষ পরিবারে



একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। মেরী সাহসে ভর করিয়া সেই চাকরী গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদাই আশঙ্কা রহিল যে, যদি কোনও রকমে প্রকৃত পরিচয় বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই।

ওধারে যত দিন যাইতে লাগিল, রুষ গভর্ণমেণ্ট পোলাণ্ডের উপর ততই অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন। মেরী দেখিলেন, এ রকম অবস্থায় আর থাকা চলে না। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিরুপায় হইয়া একদিন রাত্রে এক বৃদ্ধা নারীর ছদ্মবেশে একপ্রকার রিক্ত অবস্থায় মেরী প্যারিসে পালাইয়া আসিলেন।

প্যারিসে আসিয়া মেরী মহাবিপদে পড়িলেন। সঙ্গে একটীও কপর্দ্দক নাই; কোনও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নাই যে আশ্রয় ভিক্ষা করিবেন। চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক রাসায়নিকের ল্যাবরেটারীতে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা ও সাজানর চাকরী মিলিল। কিন্তু তাহাতে এত সামান্য বেতন মিলিত যে,বাড়ীভাড়া দিয়া শুধু পাঁউরুটী আর জলো দুধ ব্যতীত আর কিছু জুটিত না। এই সময় ম্যাদাম কুরী বলেন যে, মাংসের আস্বাদ কি রকম তাহা সত্যই আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পর অধ্যাপকেরা মেরীর প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে এ মেয়ে শুধু যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। সেই সময় ফরাসীগণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পঁয়াকারের ভ্রাতা সেই লেবরেটারীর একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মেরীর অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখিয়া তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ মেরী স্বয়ং যন্ত্রপাতি লইয়া গবেষণার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে প্যারী-

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উপাধি অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু তখনও ম্যাদাম কুরীকে কেহ জানিত না—জানিত মেরী শ্ক্লোডাউস্কাকে।

সেই ল্যাবরেটারীতে সেই সময় আর একজন তরুণ ফরাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার খ্যাতি ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। অতীব লাজুক, সারাক্ষণ কাজ করিয়া যাইতেন, কাহারও সহিত বেশী কথা বলা তাঁহার যেন সাহসে কুলাইত না। এই তরুণ বৈজ্ঞানিকটীর নাম পিয়ারে কুরী।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে তিনি প্যারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ডাক্তার, কিন্তু রাজনৈতিক মতের দিক দিয়া তিনি ঘোরতর বিপ্লবী ছিলেন। কোন বড়লোক অসুস্থ হইলে তাঁহাকে ডাকিত না, কারণ বিপ্লবী বলিয়া তাহারা তাঁহাকে ভয় করিত। তিনি বিনা পয়সায় দরিদ্রদের চিকিৎসা করিতেন; সুতরাং সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন হইয়া উঠিত।

মেরী ও পিয়ারে কুরী, দুইজনই বিপ্লবী-বৈজ্ঞানিকের সন্তান, দুইজনেই বিজ্ঞানের নিকট প্রথম যৌবনে নিজেদের আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নির্ব্বাক্ যন্ত্রপাতির রাজ্যে, লেবরেটারীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দুইজনের হৃদয় দুইজনার দিকে চাহিয়া গোপনে ফুটিয়া উঠিত। জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যে সহযোগী, প্রেম-সাধনার ক্ষেত্রে তাহাকেই পাইতে, পরস্পরের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু পিয়ারে কুরীর সলাজ অন্তঃকরণ সাহস করিয়া সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিত না।

একদিন পিয়ারে কুরী মেরীর নিকট অন্তরের সকল কথা জানাইয়া এক পত্রে লিখিলেন, "মানবতার কল্যাণ ও বিজ্ঞানের উন্নতির এই দুরূহ পথে আমরা দুইজনে যদি একত্রে যাত্রা করিতে পারি।"

মেরী এই ভীরু প্রস্তাবের অন্তরালে প্রাণের নিবেদনের কথা বুঝিলেন

এবং একদিন সত্যসত্যই মানবতার কল্যাণ ও বিজ্ঞানের উন্নতির আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া দুই তরুণ বৈজ্ঞানিক বিবাহে মিলিত হইলেন। সেইদিন হইতে মেরী শ্ক্লোডাউস্কা জগতে ম্যাদাম কুরী নামে পরিচিত।

স্বামী-স্ত্রী দুইজনার যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহারা একটা বাড়ীর অংশ ভাড়া লইলেন, কিন্তু ঘর সাজাইবার মত অর্থ এবং প্রবৃত্তি না থাকায় বিবাহিত জীবনের কোনও শ্রী ঘরে স্পর্শ করিল না। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সমস্ত মিলিত সৌন্দর্য্য ও শ্রী আর একটী ঘরে তাঁহাদের দুইজনের জীবনকে ঘিরিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল—সে তাঁহাদের ল্যাবরেটারী। প্রেমের স্পর্শে বিজ্ঞানের জড়-সাধনা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিল।

সেই সময় হেনরী বেকুরেল বলিয়া একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক "উরেনিয়াম"নামক ধাতু হইতে একটী অভিনব জিনিষ আবিষ্কার করেন। উক্ত ধাতু হইতে তিনি একরকম আলো বাহির করেন, যাহা কাগজ বা ঐ জাতীয় বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে পারিত। এই অভিনব আবিষ্কার শুনিয়া ম্যাদাম কুরী ও পিয়ারে কুরী দুইজনে উক্ত বিষয়ে আরও গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন। ম্যাদাম কুরী আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, অন্যান্য ধাতু যাহাতে "উরেনিয়াম" আছে, তাহাতে উরেনিয়াম অপেক্ষা অধিক আলো পাওয়া যাইতেছে। সেই ব্যাপার হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, নিশ্চয়ই অন্য আর এক প্রকারের অদৃশ্য আলো এই সমস্ত ধাতুতে লুক্কায়িত আছে।

দিনের পর দিন সেই অদৃশ্য আলোর অনুসন্ধানে এই নারী আপনার অন্তরের সমস্ত শক্তি ও বাসনাকে নিয়োজিত করেন। অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে কাজ করিতে হইত, কারণ, কোথায় একটুখানি এক-কণা আলো আছে, কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তের অসাবধনতার মধ্যে

যদি হারাইয়া যায়! বন্ধ্যা রাজরাণী বহুদিন পরে সন্তানসম্ভবা হইলে, যেমন সন্তর্পণে আপনার দেহাভ্যন্তরস্থ মাতৃত্বের বীজ লইয়া নিশিদিন ধ্যান করে, তেমনি ম্যাদাম কুরী তাঁহার নারীজীবনের সমস্ত সৃজনীশক্তি লইয়া সেই অদৃশ্য আলোর অনাগত শিশুর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

একদিন সেই আলো দেখা দিল, সামান্য একটা কণা, কিন্তু তাহার তেজ "উরিনিয়ামে" আবিষ্কৃত আলোর শত সহস্রগুণ।

প্যারির ১৯০০ সালের বিজ্ঞানের সভায় ম্যাদাম কুরী এই অভিনব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি সেই আলোর নাম দেন "রেডিয়াম্"। "রেডিয়ামের" আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদাম কুরীর নাম য়ুরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। প্যারীর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

"পিচব্লেণ্ড" নামক যে ধাতু হইতে ম্যাদাম কুরী "রেডিয়াম্" আবিষ্কার করেন, তাহা অত্যন্ত মহার্ঘ্য থাকায়, তাঁহারা অর্থাভাবে আর তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময় ভিয়েনার বিজ্ঞান-পরিষদ কয়েক টন "পিচব্লেণ্ড" ম্যাদাম কুরীকে উপহার দেন। পুনরায় গবেষণা করিয়া তিনি এবার পাকাপাকি ভাবে "রেডিয়ামের" সমস্ত উপাদান ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেন।

রেডিয়ামের আলোর তেজ সর্ব্বশেষে দেখা গেল যে "উরেনিয়ামের" তেজ অপেক্ষা দশলক্ষ গুণ বেশী। যে ঘরে এক কিলোগ্রাম "রেডিয়াম্" থাকে, সে ঘর যত বড়ই হউক, সে ঘরে যদি কেউ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। পিয়ারে কুরী একবার তাঁহার বুকের জামার ভিতর কৌটায় সামান্যতম "রেডিয়াম" রাখেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুকে ঘা হইয়া যায়। এই অদ্ভুত আলো পরে ডাক্তাররা নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবের মহা-কল্যাণে লাগান। ডাক্তারী-শাস্ত্রে

এই আলো যে সুবিধা আনিয়া দিয়াছে, তাহার আর তুলনা নাই। এই আলোর প্রভাবে মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের সমস্ত জিনিষ দেখা যায়। বহু দুরারোগ্য ব্যাধির দুর্জ্ঞেয় কারণ আজ রেডিয়ামের আলোতে সহজেই ধরা পড়ে। তাহাই নহে, এই আলো আবার ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। কারণ ইহার মধ্যেও "X-Ray" বিদ্যমান আছে।

১৯০৩ সালে রেডিয়াম্ আবিষ্কারের জন্য ম্যাদাম কুরী জগতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সম্মানস্বরূপ নোবেল প্রাইজ পান। নোবেল প্রাইজ পাইবার পর তিনি আরও গভীরভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ১৯০৬ সালে এক আকস্মিক মহাবিপদ্ তাঁহার চিত্তকে একে-বারে ভাঙ্গিয়া দিল। ১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল বাড়ী ফিরিবার পথে পিয়ারে কুরী পা পিছলাইয়া সহসা এক গাড়ীর তলায় পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এই ভয়াবহ ঘটনায় ম্যাদাম কুরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। সেই যে সেদিন তিনি পুরাকালের মঠধারিণীদের মত কালো বসন পরিলেন, আজও সেই পুরাণো ধরণের কালো বসনে তিনি বিভূষিত। বিংশ-শতাব্দীর প্যারিসের নিত্য বেশ-পরিবর্ত্তনের স্পর্শ সেখানে বিন্দুমাত্র লাগে নাই।

মধ্যপথে জীবনের সঙ্গীহীন হইয়া ম্যাদাম কুরী আরও গভীরভাবে আপনার গবেষণার মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার ফলে বিজ্ঞানের একটা নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইল এবং প্রত্যেক দেশে "রেডিয়াম্ ইন্‌ষ্টিটিউট" গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় ম্যাদাম কুরী তাঁহার পরবর্ত্তী গবেষণাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে তিনি পুনরায় নোবেল প্রাইজের অধিকারিণী হন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বৎসর, যখন ম্যাদাম কুরীর নাম বিশ্ব-

বিখ্যাত, যখন তাঁহার আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের আমুল পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন তাঁহাকে ফরাসী-একাডেমীর সভ্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তাব উঠিল। কিন্তু ফরাসী-একাডেমী ম্যাদাম কুরীকে সভ্য করিয়া লইতে অস্বীকৃত হন—এবং অস্বীকার করার কারণ অতীব আশ্চর্য্যজনক। এই সম্পর্কে ফরাসী-একাডেমীর বিবরণীতে লেখা আছে যে, "বহুকাল ধরিয়া এক অলঙ্ঘ্য প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, কোনও স্ত্রীলোককে ফরাসী-একাডেমীর সভ্য করা হইবে না। নারী সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা বোধহয় সুযুক্তির কাজ।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলা-ক্ষেত্র প্যারী নগরীতে মাত্র কুড়ি বছর আগে ফরাসীজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই অদ্ভুত সংস্কারকে এই রকমভাবে সম্মান করিয়া গিয়াছেন!

# সারা বার্ণার্ড

ভুবনমোহিনী সারা! সারা বার্ণার্ডের এই একমাত্র পরিচয়।

**এই অসামান্য অভিনেত্রীকে অন্তরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরা ছন্দের অর্ঘ্য উপহার দিয়া ধন্য হইয়াছেন; এই নারী অভিনয় করিবে বলিয়া নাট্যকারগণ নাট্যরচনায় নব-প্রেরণা পাইয়াছেন; এই নারী পদার্পণ করিবে বলিয়া জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরসমূহ প্রস্তর-বক্ষকে পুষ্পাকীর্ণ করিয়াছে; সেই পুষ্পাকীর্ণ পথে এই বিশ্ববিজয়িনীর বিজয় শকট যাইবে বলিয়া দেশে দেশে জনতা উন্মাদ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়াছে। উল্লাসে চীৎকার করিয়াছে, জয় ভুবন-মোহিনী সারা, জয় চিরসুন্দরী ফ্রান্স!**

এক তনুদেহা কিশোরী আপনি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একদিন ফ্রান্সের গৌরবকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই সুরভিত আত্মত্যাগের মহিমা ফ্রান্সের নামকে জগতের তীর্থপথে পরিভ্রমণে লইয়া যায়। আর একজন পুরুষ, রুধিরের রক্ততিলক দিয়া ফ্রান্সকে জগতের সম্রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; তারপর আর একজন কবি তাহার অমর-কাব্যের অলঙ্কারে পুনরায় ফ্রান্সকে বিশ্ব-মানবের অন্তরলোকে এক অপূর্ব্ব মহিমময়রূপে সাজাইয়া তোলে। সেই জন অফ আর্কের ফ্রান্স, সেই নেপোলিয়ানের ফ্রান্স, সেই ভিক্টর হুগোর ফ্রান্সকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা বার্ণার্ড পুনরায় নব-অলঙ্কারে ও নব-গৌরবে ভূষিত করিয়া বিশ্ব-মানবের নিকট তুলিয়া ধরেন। সারার গৌরবে ফ্রান্স গৌরবান্বিত হইয়া উঠে।

যে অপূর্ব্ব কলা-কৌশলে একদিন এই নারী নিখিলচিত্ত বিমোহিত করিয়াছিল, তাহার কোনও স্মৃতি-চিহ্ন আজ কোথাও নাই। যে কণ্ঠস্বর, যে ভঙ্গী, যে অশ্রুজল, যে ব্যক্তিত্ব একদিন অবলীলাক্রমে অতীতকে নব-জীবন দান করিয়াছিল, রসের প্লাবনে মানব-চিত্তকে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিরেখা জগতের কোথাও নাই। অভিনয়-কলার ইহাই অভিশাপ। মানবের শ্রদ্ধার কল্পলোক ব্যতীত সারা বার্ণার্ডের কীর্ত্তির চিহ্ন আজ কোথাও নাই। তাই আজ বিশ্বমানসলোকে রূপ-কথার রাজকন্যার মত অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া ভুবনমোহিনী সারা বিরাজ করিতেছে।

ফ্রান্সের তথা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ১৮৪৫ সালে ২৩শে অক্টোবর যৌবনের চঞ্চলকামনার অভিশাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা এডওয়ার্ড বার্ণার্ড নামক এক যুবকের প্রেম-মুগ্ধ হন এবং তাঁহারা দুইজনে গৃহত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করেন।

সারা যখন শিশু তখন তাহার পিতার সহিত তাহার মাতার বিচ্ছেদ

হয় ও অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় মাতার সহিত বালিকাকে থাকিতে হয়। পড়াশোনার কোনও খোঁজ খবর ছিল না। দরিদ্র পল্লীর কুৎসিত বীভৎসতার মধ্যে অম্লান কুসুমের মত মেয়েটী দূরের আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর মানুষ, সুন্দর জীবনের জন্য তাহার প্রাণে এক অব্যক্ত বেদনা জাগিয়া উঠিত। তাহার চারি পাশের জগৎকে বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার তখন হয় নাই বটে, কিন্তু যে মহৎ প্রবৃত্তি লইয়া সারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে রক্তের তালের সহিত পারিপার্শ্বিক জগতের বিরুদ্ধে তাহার মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল।



এইরূপ অবস্থায় একদিন সারা দেখে যে, পথ দিয়া তাহার এক ধনী আত্মীয়া

গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। ছুটিয়া রাস্তায় আসিয়া সারা কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিল, "আমাকে আপনি এখান থেকে নিয়ে যান! এই ছোট্ট বাড়ী, এই দেয়াল, এই অন্ধকার, আমি হাঁফিয়ে উঠি! সারা দিন এক টুক্‌রোও আকাশ দেখতে পাই না। আমি চোখ ভরে আকাশ দেখতে চাই—ফুল ফোটার গন্ধ নেবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে!"

বালিকার এই কাতর আবেদনে আত্মীয়াটী তাহাকে লইয়া যাইবে কথা দিল। কালই আসিয়া লইয়া যাইবে। সারা ঘরে ফিরিয়া দেখিল, নীচে গাড়ীটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহার মনে হইল যদি না আসে! তৎক্ষণাৎ বালিকা উন্মাদের মত উপর হইতে গাড়ীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রাণ-রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তটী ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভাঙ্গা হাত লইয়া সারা বিশ্ব-বিজয় করেন।

যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সারাকে বহু প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। একটী হাত ভাঙ্গা ছিল, তাহার উপর প্রথম কৈশোরে তিনি এমন কিছু সুন্দরী ছিলেন না, যাহাতে অনায়াসে তিনি প্রথমেই লোকের হৃদয় জয় করিতে পারেন। রোগা ও শীর্ণ বলিয়া বহু মঞ্চাধ্যক্ষ তাঁহাকে অভিনয়ে কোনও ভূমিকা দিতে চাহে নাই। তাহার উপর, যদিও তাঁহার অন্তরে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হইবার দুর্দ্দম বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি লোকের সম্মুখে যেদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় করিতে নামিলেন, সেদিন সম্মুখেই মাকে দেখিয়া লজ্জায় সারার আর কথা বাহির হইল না। লোকের হাস্য-বিদ্রূপের মধ্যে অসময়ে যবনিকা ফেলিয়া দিতে হইল।

ইহা ব্যতীত সারা বার্ণার্ডকে আজীবন আর একটী বৃহৎ প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সেটী হইতেছে—তাঁহার চরিত্রগত দাম্ভিকতা ও রোষ-প্রবণতা।

সারা বার্ণার্ডের কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব্ব। কোনও রাজকর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তিতায় সৌভাগ্যক্রমে সারা বার্ণার্ড ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় Comedie Trancaiseএ অভিনয়ের সুবিধা পান। কিন্তু সেখানে অভিনয় শিক্ষার সময় একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সারার ভগ্নীর প্রতি একদিন সামান্য দুর্ব্ব্যবহার করে। তাহাতে সারা বার্ণার্ড রাগিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অভিনেত্রীটির "কাণ মলিয়া" দেন। তখন সারা বার্ণার্ডের প্রতিভার পরিচয় দুই একজন লোকে জানিত মাত্র। সুতরাং এই কার্য্যের ফলে উক্ত রঙ্গালয়ের সকল সম্পর্ক তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এই ঘটনা হইতে তাঁহার মনে ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করিবার বিপুল বাসনা জাগিয়া উঠে। বহুদিন ফ্রান্সের বহু তৃতীয় শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার পর—সহসা যেন আপনাকে খুঁজিয়া পাইলেন। Odean থিয়েটারে তিনি যোগদান করিলেন। তখন সেখানে আলেক্‌জাণ্ডার ডুমার'কীন'নামক নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল। সারা তাহাতে নায়িকায় অভিনয় করিবার অধিকার পাইলেন। সেই সময় ফরাসী-সাহিত্যে এক মহাবিপ্লব চলিতেছিল। বহুদিন নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া ভিক্টর হুগো পুনরায় ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন এবং সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে তিনি ফরাসীদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। আলেক্‌জাণ্ডার ডুমা সেই সময় যুবক ছাত্রদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। 'Kean' অভিনয়ের দিন ষাটজন ছাত্র তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য অভিনয় দেখিতে আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন সারা বার্ণার্ডের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম গৌরব-রজনী। সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সারা বার্ণার্ড অভিনয় করিতেছেন—এমন সময় সেই ষাটজন ছাত্র অপমানসূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে সেই চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া

সারা এরূপ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন যে তাহার আর উত্থানশক্তি থাকে না। তাঁহার ধারণা হইল যে, এ ব্যঙ্গ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু আসলে তাহা ডুমাকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়াছিল। সেই রাত্রে সারা অপূর্ব্ব অভিনয় করেন এবং তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী উন্মাদ হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া বারে বারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে। মঞ্চাধ্যক্ষ সারাকে গিয়া খবর দিল যে, দর্শকরা তাহাকে দেখিবার জন্য উন্মাদ কলরব করিতেছে। সেই রাত্রি হইতে সারা বার্ণার্ডের নাম সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর হইতে তাঁহার অভিনয় দেখিবার জন্য ক্রমশঃ দেশ বিদেশ হইতে লোকে প্যারীতে আসিতে লাগিল। সমগ্র য়ুরোপ সারা বার্ণার্ডের অভিনয়ে সম্মোহিত হইল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও জার্ম্মাণীতে যুদ্ধ হয়। আনন্দ-কলগানে মুখরিতা প্যারী নগরীতে মৃত্যুর ছায়া সমস্ত ম্লান করিয়া তুলিল। কাজকর্ম্ম, রঙ্গ-অভিনয় সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। প্যারীর রাস্তায় জার্ম্মাণ বোমা আসিয়া পড়িতে লাগিল। জার্ম্মাণরা প্যারী আক্রমণ করিল। সেই সময় সারা বার্ণার্ড রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবিকার রূপে আহত সৈনিক ও লোকদের সেবার জন্য একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। Odean থিয়েটার হাঁসপাতালে পরিণত হইল। সেই মৃত্যু ও আশঙ্কার মধ্যে সারা বার্ণার্ড একান্ত নির্ভীকভাবে আহতদের সেবা করিয়া জাতির অন্তরের অতি ঘনিষ্ঠতম দেশে স্থান অধিকার করিয়া লন।

যুদ্ধবিরতির পর জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে তিনি পুনরায় Commedie Francaiseএ যোগদান করেন। এই সময় তাঁহার যশ ফ্রান্স ছাড়াইয়া জগতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সারা লণ্ডনে অভিনয় করিবার জন্য আসেন। এই অভিনয় দেখিবার

জন্য ইংলণ্ডের সম্রাট হইতে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হন। এই রজনীর অভিনয়ের ফলে সারা বার্ণার্ড "The Divine Sarah" নামে অভিহিত হন। অভিনয়ের শেষে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান এবং দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বার বার উন্মাদ চীৎকার করায় বিখ্যাত অভিনেতা মুনে-সালীকে সারা বার্ণার্ডের অচৈতন্য দেহ ধরিয়া পুনরায় দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে আসিতে হয়। সেই রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক জন মারে লিখেন,—When recalled with loud cries, Mrs. Bernahardt appeared exhausted by her efforts and supported by Mounet-Sally she received on ovation which I think is unique in the annals of the theatre of England—জনতার উন্মাদ আহ্বানে যখন মুনে-সালী সারা বার্ণার্ডের অবসন্ন দেহ ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে পুনরায় আসিলেন, তখন সারা বার্ণার্ড যে বিপুল অভিনন্দন পান—ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাহা অভুতপূর্ব্ব।

এই সময় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ব্যক্তিগত ভাবে অভিনয় করার দরুণ Commedie Francaiseএর সহিত তাঁহার পুনরায় বিবাদ হয়। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য ফরাসী-সংবাদ-পত্রমহলে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু লেখা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া সারা আবার Commedieএর সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সেবার তাহা মিটমাট হইয়া যায়। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনায় তাঁহার সহিত Commedieর পুনরায় ঘোরতর বিবাদ হইল। একটী ভূমিকায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় দরুণ সারা বার্ণার্ডের ভয়ানক চিত্তক্ষোভ হয় এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি গোপনে এক গ্রামে চলিয়া যান। ওধারে থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষগণ সারার অভাবে

অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে তাঁহারা সারা বার্ণার্ডের নামে আদালতে ক্ষতি পূরণের মামলা আনিল এবং বিচারে সারা বার্ণার্ডের উপরে এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক ক্ষতি পূরণস্বরূপ দিবার আদেশ হইল। এই ভয়াবহ অবস্থায় সারা বার্ণার্ডের প্রতিভার অহঙ্কার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঠিক করিলেন, ফ্রান্সে আর অভিনয় করিবেন না—সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি এই টাকা সংগ্রহ করিবেন। এই স্থির করিয়া নিজের একটী দল গঠন করিয়া সারা বার্ণার্ড বিশ্ব-বিজয়ে বাহির হন। যেদিন সারা বার্ণার্ড ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া যান, সেদিন ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সারা বার্ণার্ডের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। Victor Hugo, J. J. Weiss, Zola, Emile de Girardin, Jules Valles, Jules Lemaitre, Francois Coppee, Richepin, Haraucourt, Henri de Bornier, Catulle Mendes, Parodi, Edmond Rostand—জগতের আর কোনও লোক এইরূপ এক সঙ্গে একটী শতাব্দীর পরিপূর্ণ অর্ঘ্য আর পায় নাই। আমেরিকার পঞ্চাশটী নগরে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ একশো ছাপ্পান্ন রজনী অভিনয় করেন এবং ছাব্বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার দু'শো ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন করেন।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সারা বার্ণার্ড যখন পুনরায় ফ্রান্সে আসিলেন, তখন সমগ্র ফ্রান্স তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব অভিনন্দন প্রদান করিল। যেখান্ দিয়া যিনি গিয়াছেন, সেইখানেই উন্মত্ত জনতা সমবেত হইয়া চীৎকার করিয়াছে, Vive Sarah, Vive la France.

Commedie Francaiseএর কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে সারা পুনরায় উক্ত রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেন এবং জাকোয়ে দামালা নামক একজন অভিনেতাকে বিবাহ করেন। ১৯১৪ সালে সারা ভয়ানক অসুস্থ

হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ডান পায়ে এক অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি পঙ্গু হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি—কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বৃদ্ধ বয়সে সেই পঙ্গু অবস্থাতেও সারা বার্ণার্ড রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেন নাই। যৌবনের যে প্রদীপ্ত প্রতিভা একদিন সমগ্র ভুবনকে অগ্নিশিখায় জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, বার্দ্ধক্যেও তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বিভিন্ন ভূমিকায় ভুবনমোহিনী সারা তেমনি লীলা-কৌশলে সকলের চিত্ত আনন্দ রসে আপ্লুত করিতেন। মহাকাল তাঁহার প্রতিভার কণামাত্রও অপহরণ করিতে পারে নাই। ডান পা ভাঙ্গা অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া শেষকালে তিনি অভিনয় করিতেন, সমগ্র ফ্রান্স আনন্দনির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহা শুনিত। শোক-তাপ-ব্যাধিও তাঁহার প্রতিভার কণামাত্রও অপহরণ করিতে পারে নাই।

অবশেষে ১৯২৩ সালের ২৬শে মার্চ্চ প্রিয় পুত্র সরিকের কোলে মাথা রাখিয়া পূর্ণ-বার্দ্ধক্যে যৌবনের সমস্ত মহিমা লইয়া সারা বার্ণার্ড এই ধরণীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন। সমগ্র ফ্রান্স জাতীয় শোক-দিবস হিসাবে উক্তদিন পালন করে।

অভিনেত্রী ব্যতীত সারা বার্ণার্ড একজন বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্র-শিল্পী ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাস্কর-শিল্পের নিদর্শন জগতের বহু শ্রেষ্ঠ সমালোচকের সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে। সেক্সপীয়ারের অমর নায়িকা "অফেলিয়ার" অনবদ্য মর্ম্মর-মূর্ত্তি সারা বার্ণার্ডের শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

সারা বার্ণার্ড তাঁহার জীবদ্দশায় সেই সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্মান পাইয়াছেন, তাহার ইতিহাস কাহিনীর মত অপূর্ব্ব। য়ুরোপের বহু সম্রাট তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে

অভিনন্দিত করিয়াছেন। যেদিন সারা বার্ণার্ড ইংলণ্ডে প্রথম পাদার্পণ করেন, সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "অগণিত জনতার মধ্যে কোনও মতে চলিতে পারিতেছিলাম না। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন আমার কানে কানে বলিল, 'দেখছি, এরা ফুলের কার্পেট বিছিয়ে দেবে।'

"ভিড়ের মধ্যে একজন ইংরাজ-যুবক সেই কথা শুনিতে পায়। সে আমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া এক রাশ 'লিলি' আমার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল। শুভ্র লিলিগুলির বিকাশোন্মুখ পাপড়ি আমার পা ছাইয়া ফেলিল। তাহার উপর পা দিতে শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। কিন্তু জনতার চাপে সেই ফুলের উপর পা দিয়াই চলিতে হইল। তাহা দেখিয়া যুবকটীর উজ্জ্বল নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, আমার জয়োল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে জানিলাম, যুবকটী Oscar Wilde ইংরাজী সাহিত্যের প্রদীপ্ত সূর্য্য!"

তখন ভিক্টর হুগোর নাম সমগ্র য়ুরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত—ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো মানেই ফ্রান্স। হুগোর এক নাটকে সারা বার্ণার্ড নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। হুগোর নিয়ম ছিল যে, তাঁহার কোনও নাটক অভিনীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পাঠ শুনিতে হইত। সেই প্রথামত হুগো সারা বার্ণার্ডকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন সারা বার্ণার্ড ও হুগোর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। হুগোর অপরূপ ব্যক্তিত্ব ও যশের কথা সারা শুনিতেন এবং সেই সঙ্গে এই লোকটী যে সমগ্র ফ্রান্সের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সারার ভক্তরা তাঁহাকে উপদেশ দিল যে, তিনি যেন হুগোর বাড়ীতে না যান। অসুস্থ বলিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া দিন। সারা সেই

পরামর্শ শুনিলেন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিলেন,—"আপনার রাণী ( কারণ সারা উক্ত পুস্তকে রাণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন ) অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পারিষদরা তাহাকে বাহিরে যাইতে বারণ করিতেছে। রাজসভার ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে আপনাকে আর কি বলিব ? আশা করি, আপনার রাণীর এই ব্যবহার ক্ষমা করিবেন।"

ভিক্টর হুগো সেই পত্র পাইয়া উত্তর দিলেন, "তথাস্তু। আমি তো তোমার ভৃত্য—ভিক্টর হুগো।" সারা বার্ণার্ড পরাজিত হইলেন এবং জীবনব্যাপী সমস্ত বিজয়ের মধ্যে সারা বার্ণার্ড এই পরাজয়ের স্মৃতি-চিহ্নটুকুই সব চেয়ে অমূল্য সম্পদ্‌রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

# খালেদা খানুম

বর্ত্তমান য়ুরোপে যে কয়েক জন মহিলা আপনাদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তিদ্বারা য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগ পরিবর্ত্তনে সাক্ষাৎভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকের ধারণা নব্য-তুরস্কের জননী খালেদা খানুমের আসনই সর্ব্বপ্রথমে

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্ককে য়ুরোপের অন্যান্য জাতিরা Sickman of Europe 'য়ুরোপের চিররুগ্ন জাতি' বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। বস্তুতঃ তুরস্কের তখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না-বলিলেই হয়। গ্রীস তুরস্ককে একেবারে গ্রাস করিয়াই ফেলিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্ম্মাণীর পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগদান করে এবং সেইখান হইতেই তাহার নব-যুগের সূচনা হয়। একজন সামান্য সৈনিকের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব্ব রণ-নৈপুণ্যে তুরস্ক গ্রীসকে তাহার সীমান্ত হইতে বিতাড়িত

করিল, স্বদেশ হইতে সমস্ত বিদেশীয় প্রভাব দৃঢ়হস্তে দূর করিল, পুরাতন খলিফাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া এক নূতন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল, একদিনের মধ্যে জড়গ্রস্ত একটা জাতিকে নব-তেজে ও নব-শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। কামালপাশার এই অদ্ভুত কৃতিত্ব বিংশ-শতাব্দীর একটা স্মরণীয় ঘটনা। যে জড়তা ও প্রাচীনতার মোহে ইসলামিক দেশসমূহ য়ুরোপীয় জাতিদের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইতেছিল, কামালপাশা একমুহূর্ত্তে সবলহস্তে সেই জড়ত্বের সমস্ত গ্রন্থি কাটিয়া দিলেন। কামালপাশার এই অভিনব অভ্যুদয়ে হতবীর্য্য জাতিদের বুকেও এক আশার ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

এই অসাধ্যসাধনে যাঁহারা সেদিন কামালের পাশে থাকিয়া সমগ্র তুরস্ক জাতির ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে খালেদা খানুমের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

খালেদা খানুমের পিতা ছিলেন সিংহাসন-চ্যুত শেষ খলিফা সুলতান আবদুল হামিদের অন্যতম প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনি কিশোরকাল হইতেই রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত পরিচিত হন এবং সেই সময় হইতে যে-সমস্ত কারণে জাতির অধঃপতন হইতেছিল, তাহার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তখনও তুরস্ক নারী পর্দার অন্তরালে জীবন-যাপন করিত—তখনও বহুবিবাহের অনর্থে সমস্ত পরিবার বিক্ষুব্ধ—জাতির মধ্যে কোনও শিক্ষা নাই—খলিফা আপনার বিলাস লইয়াই ব্যস্ত—কুসংস্কারের মোহে জাতি তখন পঙ্গু। অন্তঃপুরের অন্তরালে থাকিয়া খালেদা খানুমের অন্তরে এই সমস্ত ত্রুটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অঙ্কুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। বাল্যে তিনি ইস্তাম্বুলের আমেরিকান কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলেন।

জাতির এই জড়তা ও পঙ্গুতার বিরুদ্ধে খালেদা খানুম লেখনী ধরিলেন। তাঁহার প্রতিভা প্রথম বিকশিত হইয়া উঠে—সাহিত্যে এবং তিনি বর্ত্তমানে তুরস্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। যে নব-যুগের সৈনিকরূপে পরে কামালপাশা অবতীর্ণ হইলেন, তাহার ভাবরূপ প্রথম এই নারী তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। খালেদা খানুমের সাহিত্যিক প্রতিভা যে বর্ত্তমান য়ুরোপের যে কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সমান, তাহা যে কেহই তাঁহার আমেরিকা হইতে প্রকাশিত আত্মকথা-সম্বলিত নব্য-তুরস্কের অভ্যুত্থান-কাহিনী পড়িয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন।



উনিশ বৎসর বয়সে খালেদা খানুম স্বেচ্ছায় তাঁহার গণিত-

শাস্ত্রের অধ্যাপক সালেহজেবেকে বিবাহ করেন। কিন্তু স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করায় তিনি পরে স্বামী ত্যাগ করেন। বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁহার নিজের স্বামী যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, তখন সমস্ত সৌহৃস্থ সত্ত্বেও খালেদা ভিন্ন স্থানে গিয়া দুই পুত্রকে লইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর তিনি সাক্ষাৎভাবে সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যতিরেকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের নারীর পক্ষে সাক্ষাৎভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা তুরস্কে এই প্রথম।

তুরস্কজাতির মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী। বালকবালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত তখন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করিয়াও যখন কোনও ফল হইল না, তখন এই বিদ্রোহী নারী সমাজের ভ্রূকুটীকে সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গ্রামে গ্রামে সেই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তুরস্ক জাতির ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী, যিনি সমাজের সমস্ত অপমান সহ্য করিয়া রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বল্কান্ যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষার কোনও ব্যবস্থা নাই দেখিয়া, খালেদা অগ্রসর হইয়া একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করাইলেন এবং তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফার বিরুদ্ধে গোপন বিপ্লবী দল সংগঠিত হইতেছিল। খালেদা এই বিপ্লবী দলে যোগদান করিলেন এবং সংস্কার-মূলক তানিন নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন এবং তিনিই হইলেন তাহার প্রথম সম্পাদক। তুরস্কের সংবাদপত্রের

ইতিহাসে তিনিই প্রথম সম্পাদিকা। ১৯০৮ সালে এই বিপ্লবী দল প্রকাশ্যভাবে একবার মাথা তুলিয়া উঠে ; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ধরা পড়েন। অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত খালেদাও তুরস্ক হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিত হইয়া মিশর ও পরে ইংলণ্ডে কিছুকাল অতিবাহিত করেন।

তাহার পর তুরস্কে "Union and Progress" দল প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তুরস্কে ফিরিয়া আসেন। তখন বিপ্লবী-দল দেশের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং খালেদা তীব্রভাবে খলিফার রাজ্যশাসন-নীতিকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

গত মহাযুদ্ধের পর অবসাদগ্রস্ত জাতিকে যখন কামালপাশা নূতন জীবনের দিকে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন শিক্ষা-সচিবরূপে খালেদা খানুম তুরস্কের শাসন-ব্যাপারের সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত ছিলেন। শিক্ষা-সচিব রূপে তিনি তুরস্কের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা স্বহস্তে পরিবর্ত্তন করেন এবং নূতন বিদ্যালয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের সহিত জাতির মধ্যে তিনি নূতন শিক্ষক ও নূতন শিক্ষয়িত্রীও গড়িয়া তোলেন।

তুরস্কের নব্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে কিন্তু কামালপাশার সহিত তাঁহার মতান্তর হইতে লাগিল। অপর সকলের মতন তিনি কামালপাশার স্বেচ্ছা-তন্ত্রমূলক সকল পন্থার অনুমোদন করিতেন না। ফলে এই দুই ব্যক্তিত্বে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কামালপাশা জাতির ডিক্টেটররূপে তাঁহার মতকে বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু খালেদা খানুমের ব্যক্তিত্ব তাঁহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। খালেদা কামালের ব্যক্তিগত চরিত্রের পর্য্যন্ত সমালোচনা আরম্ভ করিলেন এবং কামালের এই উদগ্র স্বেচ্ছাতন্ত্র ও পাশ্চাত্য-প্রীতির বিরুদ্ধে তিনিই

প্রথম প্রতিবাদ তুলিলেন। ডিক্টেটরবাদে যাহা হয়, এখানেও তাহাই হইল। তুরস্কের জননী, নব্য-তুরস্কের শাসন-কর্ত্তার দ্বারাই পুনরায় নির্ব্বাসিত হইলেন।

এখন এই চির-বিদ্রোহী নারী আমেরিকায় তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন। তুরস্কের ভবিষ্যৎ-জীবনে এই নারীর আর কোন প্রভাব প্রতিফলিত হইবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়।

# মিসেস্ সান-ইয়াৎ-সেন

চীনের মুক্তিদাতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের স্মৃতিকে আজ জগৎবাসী শ্রদ্ধায় স্মরণ করে এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিবে। শতমোহ ও অবসাদগ্রস্ত জাতিকে তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন-সাধনা দ্বারা নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চীনদেশে তাঁহার নাম আজ পরম-দেবতার মত লোকে উচ্চারণ করে।

তাঁহার মহিয়সী জীবন-মরণ-সঙ্গিনীকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবন যে কি ছিল তাহা বুঝিতে হয়। যে বীরপুরুষকে সর্ব্বদাই মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, একটা মোহগ্রস্ত অচেতন জাতিকে শত শত বাধার বিপক্ষে যাঁহাকে জাগাইতে হইয়াছে, এই নারী সর্ব্বদাই ছায়ার মতন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন, হৃদয়ের অধিকারের দাবীর সহিত বিপ্লবীর ও জাতিস্রষ্টার সকল দায়িত্ব ও অধিকারের অংশ স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়াছেন।

ডাঃ সানের জীবন অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর। সমগ্র জীবন তাঁহার বিপ্লব সাধনা, নির্ব্বাসন, রণ-ক্ষেত্র ও নিদারুণ রাজনৈতিক সংগ্রামে

অতিবাহিত হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সতেরো বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহার মাথার জন্য এক লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। 'মাঞ্চু রাজ্যের গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতক তাঁহাকে আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারতসাগরের দ্বীপে দ্বীপে যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই অনুসরণ করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশে নানা ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাকে অর্থ, যুদ্ধের সরঞ্জাম সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। নান ছদ্মবেশে মৃত্যুকে করপুটে লইয়া চীনের গ্রামে গ্রামে তাঁহাকে বিপ্লবের বাণী ছড়াইতে হইয়াছে। কোটী কোটী লোকের শাসনের দায়িত্ব, সমগ্র বিদেশী শক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে



পালন করিতে হইয়াছে। সহস্র বর্ষের ঘুণ-ধরা মাঞ্চু রাজবংশকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থলে তাঁহাকে নবজাতি সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই বিপুল জীবনে মিসেস্ সান-ইয়াৎ সেন শুধু সহধর্ম্মিণী নয়, সহকর্ম্মিণী রূপে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক ছিলেন।

ম্যাদাম সান্-ইয়াৎ-সেন চীনের অতি সম্ভ্রান্ত সুং-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম হইতেছে সুং-চিং-লিঙ। তাঁহার ভ্রাতা টি-ভি-সুং বর্ত্তমান চীন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব এবং বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেণ্টকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইনিই সব চেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন। বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট চ্যাংকাই শেক তাঁহার আপন ভগ্নীপতি।

কুমারী সু-চিং-লিঙ আমেরিকার জর্জ্জিয়া প্রদেশের ওয়েস্‌লীয়ান্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে ফিরিয়া আসেন। সেই সময় চীনে মাঞ্চুরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চারিদিক দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তখন চীন-যুবক-যুবতীদের মধ্যে এক অভিনব জাগরণ দেখা দিতেছিল। দলে দলে বিপ্লবী যুবক জাতির কল্যাণকামনায় প্রাণবিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইল। ডাঃ সানের অপূর্ব্ব জীবন চীন-যুবকদের চিত্তে নব-জীবনের অগ্নি-শিখা জ্বালাইয়া দিল। সকলের মুখে ডাঃ সানের কথা। ডাঃ সান তখন চীন হইতে নির্ব্বাসিত—তাঁহার মাথার উপর দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুং-চিং-লিঙ আপনার অন্তরের নিভৃতে এই বিপ্লবী বীরকে বরণ করিয়া লইল। হিন্দু-নারীর মত চীন-নারীও একান্ত ভাবে পরিবার-তন্ত্রশাসিত। সনাতন গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের বাহিরে তাহার কোনও অস্তিত্ব ছিল না এবং পারিবারিক অনুশাসনের

উর্দ্ধে তাহার স্বীয় ব্যক্তিত্বেরও কোন বিকাশ সম্ভব ছিল না। ইহার কোনও রকম ব্যতিরেক কলঙ্কের কথা হইত। যে বংশ যত সম্ভ্রান্ত হইত, সে বংশে লোকাচার ততই প্রবল ভাবে প্রতিপালিত হইত।

ডাঃ সান ও কুমারী সুং-চিং-লিঙ এর রোমাণ্টিক প্রেম-কাহিনী জগৎ বিশেষ ভাবে কিছুই অবগত নহে। তবে, সমগ্র জাতি যখন সেই রহস্য-ময় বিপ্লবী বীরকে চিত্তাসনে শ্রদ্ধায় বসাইয়াছিল, সেই সময় এই কুমাবীও অন্তরের সিংহাসনে তাঁহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দিতেন এবং সেই সঙ্গ বিপ্লবীব সহচরী হইয়া মৃত্যু-কণ্টকিত জীবনের রহস্যময় স্বাদ পাইবার জন্য তাঁহার নাবী-চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আপনার অন্তরে সুং-চিং-লিঙ বিপ্লবী হইয়া উঠিলেন।

ওধারে তাঁহার পবিবাব হইতে যথাবীতি বিবাহের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল এবং পাত্রও স্থির হইয়া গেল। বিবাহের আয়োজন যখন সমস্তই ঠিক, তখন একদিন নিঃশব্দে কাহাকেও না বলিয়া গৃহের বন্ধন ছিঁড়িয়া সুং-চিং-লিঙ সেই নির্ব্বাসিত বিপ্লবীর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য জাপানে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে মৃত্যুকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাবা উভয়ে মিলিত হইলেন! সেই দিন হইতে তিনি ম্যাদাম সান-ইয়াৎ-সেন রূপে জগতে পরিচিত। ডাঃ সনের সেক্রেটারী ও সহযোগী রূপে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে সমস্ত বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ডাঃ সানের সহিত তাঁহার নাম চিরকালেব জন্য বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

ইচ্ছা থাকিলে ম্যাদাম সান, ডাঃ সানের মৃত্যুর পর চীনের যে কোনও উচ্চ পদ অধিকার করিতে পারিতেন। এমন কি তিনি চীনের প্রেসি-ডেণ্টও হইতে পারিতেন। বহুবার তিনি চীন জাতীয় দল কোয়ামিংটাঙের সভাপতির কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা একান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

কারণ ম্যাদাম সান্ যশকে ভয় করেন, সম্মানের সমারোহ তাঁহার সুন্দর নারী-চিত্তকে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত করিয়া তোলে। ডাঃ সানের মৃত্যুর পর তিনি তাই সকল রকমে এই সম্মানের সমারোহ হইতে নিজেকে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান চীনের দুইটী প্রধান প্রতিষ্ঠানের সহিত ম্যাদাম সানের নাম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজড়িত। একটী, হ্যাংকো শহরে নারীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত "The Women's Institute of Political Training." জগতে এই প্রতিষ্ঠান অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়টী, আহত ও অকর্ম্মণ্য সৈনিকদের জন্য "Wounded Soldier's Relief Association." দুইটী প্রতিষ্ঠানই জাতির দুইটী প্রধান অঙ্গ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ডাঃ সান্ যখন পরলোকগমন করেন, তখন জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ-কর্ম্মপদ্ধতি যাহাতে আদর্শচ্যুত না হয়, তাহার জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বাসনা, অর্থাৎ জাতীয় দলের কর্ম্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া উইল স্বরূপ তাহাই জাতিকে দিয়াছেন। এই উইলে লিখিত আদর্শই চীন জাতীয় দল বেদস্বরূপ গ্রহণ করে।

ডাঃ সান্ তাঁহার জীবদ্দশায় সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তিনি কৃষক ও শ্রমজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জাতীয়তার সহিত রুষ-সাম্যবাদের সংমিলন করেন। ডাঃ সানের ইচ্ছা-অনুসারে লেনিন বরোদীন নামক একজন রুষ বিশেষজ্ঞকে চীনে পাঠান এবং বরোদীন ও ম্যাদাম সান-ইয়াৎ-সেনের প্রচেষ্টায় চীনে একটী শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট দল গঠিত হইল। ডাঃ সানের মৃত্যুর পর জাতীয় দল ক্রমশঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল—একদল হইল ম্যাদাম সান-ইয়াৎ-সেন ও বারোদীনকে লইয়া, দ্বিতীয় দল হইল প্রেসিডেণ্ট চ্যাংকাই শেককে লইয়া।

বিপ্লবের যুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকরা নানাভাবে জাতীয় দলের সাহায্য করে এবং তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে চীন-জাতীয়দল অত শীঘ্র জয়লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু শাসন-ভার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট চ্যাংকাই শেক ডাঃ সানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি হইতে সরিয়া আসিয়া বণিক-তন্ত্রের পোষকতাই করিতে লাগিলেন এবং গণতন্ত্রের যে আদর্শ লইয়া চীনের নব-অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বিমলিন হইয়া পড়িল। এই সময় ম্যাদাম সান-ইয়াৎ-সেন চ্যাংকাই শেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বামীর আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু সেনাপতি চ্যাংকাই শেকের হাতে শাসন-ভার ও তাহার উপর সৈন্যদলের উপর তাঁহার প্রভাব সকলের চেয়েও বেশী। ক্রমশঃ চ্যাংকাই শেক ও ম্যাদাম সানের মধ্যে সংঘর্ষ এমন প্রবল হইয়া হইয়া উঠিল যে, দুইদলে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হইতে লাগিল। চ্যাংকাই শেকের আদেশে ম্যাদাম সান ও বরোদীন চীন হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন এবং সেই সঙ্গে চ্যাংকাই শেক চীন-কম্যুনিষ্ট-দল উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র ধরিলেন। চীনের জাতীয় দল কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া গঠিত সাম্যবাদী দলকে সমূলে উচ্ছেদ করিলেন। একদিন যাহারা ডাঃ সানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চীনের নব যুগকে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের রক্তে চীনের মাটী রঞ্জিত হইল।

চীন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ম্যাদাম সান মস্কোতে যান। সেখান হইতে যখন তিনি এই হত্যার সংবাদ শুনিলেন, চ্যাংকাই শেককে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এক টেলিগ্রাম করেন।

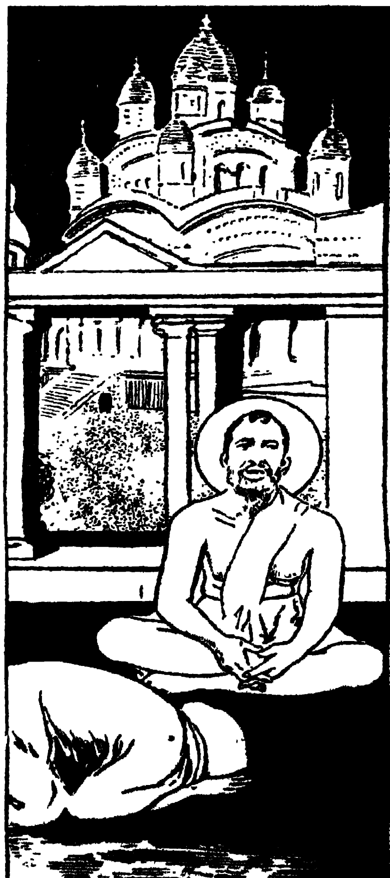
ম্যাদাম সানের প্রভাব হইতে জনসাধারণের চিত্তকে মুক্ত করিবার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসার প্রচার করা হয়। ম্যাদাম সান্ একজন অপরূপ সুন্দরী নারী এবং তিনি যখন ডাঃ সানকে বিবাহ করেন,

তখন দুজনের বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। নির্ব্বাসিত হইয়া যখন তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তখনও তিনি যৌবন-শ্রীতে বিমণ্ডিত।

কোনও কোনও লোক ম্যাদাম সানকে চীনের জন অফ আর্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সে নারীও একদিন সমস্ত কুৎসা এবং অপবাদ মাথায় লইয়া দেশকে সেবা করার অপরাধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিয়াছিল; বিংশ-শতাব্দীতেও ম্যাদাম সান দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া জাতিকে অক্লান্ত ভাবে সেবা করার অপরাধে আজ নির্ব্বাসিত। পুড়াইয়া মারার প্রথা বৈজ্ঞানিক মানব তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কুৎসার মোহ সে আজও এড়াইতে পারে নাই। মতের মিল না হওয়ার অপরাধে আজও মানুষকে কুৎসার বোঝা বহিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র অগ্নির মত পাবক—স্বতঃ উজ্জ্বল, কুৎসা তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না।

ম্যাদাম সানের চরিত্র অগ্নিশিখার মত পূত ও ভাস্বর। নব্য-চীনের দেউলে সে-শিখা নিত্যকাল জ্বলিবে—ক্ষণস্থায়ী যুগের সামান্য ফুৎকারে তাহা নিভিবার নহে।

# রাণী রাসমণি



এক শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার মানচিত্রের মধ্যে কোথায় দক্ষিণেশ্বর বলিয়া একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম পড়িয়া ছিল, তাহার খবর কেহ জানিত না। আজ ভারতের সীমান্ত ছাড়াইয়া য়ুরোপ আমেরিকায় প্রত্যেক সুধী ব্যক্তির নিকট দক্ষিণেশ্বর জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক মহা-তীর্থ বলিয়া পরিচিত। সেদিনকার পাগল গদাধর পুরোহিত আজ রামকৃষ্ণ-পরমহংস। যাহার জীবনী অনুশীলনে আজ ফ্রান্সের তথা য়ুরোপের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণীষা রমাঁ রলাঁ ধন্য।

কিন্তু এমন দিনও ছিল, যখন গদাধর পুরোহিতকে পূজাজ্ঞানশূন্য পাগল ব্রাহ্মণ বলিয়া মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মন্দিরের কাজ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং পাগল গদাধর

বিতাড়িতও হইতেন, যদি এক আসামান্যা প্রতিভাশালী পুণ্যময়ী বঙ্গ-রমণী সেদিন তাঁহার অপরূপ অন্তর্দৃষ্টি দিয়া এই উন্মাদের মধ্যে মহা-মানবের লক্ষণ না দেখিতে পাইতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত-বাণী আজ যে লক্ষ তাপিত চিত্তে অমৃত-বর্ষণ করিতেছে, তাহার প্রথম সন্ধান পান সেই বঙ্গ-ললনা; এবং তাঁহারই মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব স্নেহে ও অন্তরের পুণ্য-পিপাসার ফলে বিতাড়িত গদাধর পুরোহিত একদিন পুনরায় গঙ্গা-তীরে সাধক রামকৃষ্ণরূপে দেখা দিলেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রত্যেক শিলা, গঙ্গাসমীর-চঞ্চল প্রত্যেক পল্লব-মর্ম্মর মনে হয় সেই পুণ্যবতীর নাম আজিও ধ্যান করিতেছে। তাঁহার নাম রাণী রাসমণি।

হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোনা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র পিতার ঘরে রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াও তিনি রাণী ছিলেন, কারণ পিতা হরেকৃষ্ণ দাস আদর করিয়া কন্যাকে রাণী বলিয়া ডাকিতেন। ডাকনাম যে পরে সার্থক হইয়া উঠিবে—ডাকিবার সময় পিতা হয়ত তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু এগারো বৎসর যাইতে না যাইতেই পিতা সবিস্ময়ে দেখেন যে তাঁহার কন্যা সত্যই রাজ-রাণী হইতে যাইতেছেন। সেই সময় কলিকাতা সহরের অন্যতম সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধনী রায় রাজচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব আসিল এবং ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ দরিদ্রের কুটীরশোভিনী রাসমণির রায় রাজচন্দ্র দাসের শুভ-বিবাহ হইয়া গেল। এখানে রাজচন্দ্র দাসের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

রাজচন্দ্র দাসের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বাঁশের ব্যবসায় করিতেন। সাধারণতঃ দূরদেশ হইতে বাঁশ চালান দিবার জন্য মাঁড় বাঁধিয়া বাঁশ গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। বাঁশের ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রভূত ধনশালী হন এবং সেই হইতে তাঁহাদের বংশকে "মাঁড়" আখ্যা দেওয়া

হইয়া আসিতেছে। ইঁহারাই কলিকাতার জানবাজারস্থ বিখ্যাত মাঁড়ের বংশ।

রামচন্দ্র দাসের পিতা চাউলের ব্যবসায়ে বিপুল অর্থসংগ্রহ করেন এবং তিনি যশোহর জেলার মকিমপুর পরগণা ক্রয় করেন রাসমণি স্বামিগৃহে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজচন্দ্রের সৌভাগ্য ও ধনসম্পত্তি যেন মায়াবলে প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। যে ব্যবসায়ে হাত দেন তাহাতেই প্রভূত লাভবান্ হন। ১২৪৩ সালে যখন তিনি পরলোকগমন করেন, তখন তিনি সারা বাঙ্গালার মধ্যে বিশাল জমিদারী রখিয়া যান। জমিদারী ব্যতীত তিনি প্রায় কোটী টাকা নগদ রাখিয়া যান।

এই বিপুল সম্পত্তির ও জমিদারীর মধ্যে সহসা স্বামিহীনা হইয়া রাসমণি অন্তরে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু বাহিরে তেজস্বী রমণীর মত তিনি স্বয়ং সেই বিশাল জমিদারী পরিচালনের প্রত্যক্ষ ভার লইলেন। তাঁহার কোনও পুত্র ছিল না,—তিন কন্যা। তিনজন জামাতাই তাঁহার নিকট থাকিতেন এবং তাঁহারাই এই বিরাট দায়িত্ব পরিচালনে তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণির তত্ত্বাবধানের ফলে জমিদারীর আয় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাণী রাসমণি একদিনের জন্য ভোলেন নাই যে, তিনি দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দারিদ্র্য কি তাহা তিনি জানিতেন, তাই তাঁহার হস্ত দানের জন্য চির উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ ছিল, অপরদিকে তাহা অপূর্ব্ব করুণারসে ভরপুর ছিল। উত্তর বঙ্গে রাণী রাসমণির পুণ্যক্রিয়া বাঙ্গালী জাতির সহিত চিরদিন বিজড়িত থাকিবে।

বিষয়-কর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হইয়াও তাঁহার মন সর্ব্বদাই আত্মিক

কল্যাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। দুর্গাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর প্রত্যেক পার্ব্বণে জানবাজারের বাড়ীতে মহামহোৎসব সারা বছর ধরিয়া লাগিয়াই ছিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ অনাথ আতুর সকলেই রাণী রাসমণির দাক্ষিণ্যের স্পর্শ পাইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত।

স্বামীর জীবদ্দশায় রাণী রাসমণির পরামর্শে রাজচন্দ্র হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে গঙ্গার তীরে একটী বিপুল ঘাট তৈয়ারী করাইয়া দেন এক্ষণে এই ঘাটই প্রসিদ্ধ 'বাবু-ঘাট' নামে খ্যাত। এই ঘাট লইয়া রাসমণির সহিত একবার সরকারের সংঘর্ষ লাগে। কথিত আছে যে, একবার কোনও পূজা উপলক্ষে রাণী রাসমণির বাড়ী হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ পূজাসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার জন্য বাবু ঘাটে যাইতেছিলেন। সঙ্গে বাদকরা ছিল এবং তাহারা সারা পথ মনের আনন্দে বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছিল। সেই বাদ্যধ্বনিতে পথিপার্শ্বস্থ বাটীতে এক সাহেবের ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তিনি শান্তি-ভঙ্গের অছিলায় আদালতে নালিশ করেন। এই ব্যাপার শুনিয়া রাণী রাসমণি উত্তেজিত হইয়া পরের দিন হুকুম দিলেন, যেন আরও বহুসংখ্যক বাদক লইয়া যথারীতি বাদ্য বাজাইয়া ঐ পথ দিয়া যাওয়া হয়। এই ব্যাপারের পর সরকার হইতে হুকুম আসিল যে, এরূপ কার্য্য অবৈধ এবং তাঁহার উচিত ভবিষ্যতে আর এই প্রকার আইন-অমান্য না করা। সরকারের এই আদেশে রাণী রাসমণি তাঁহার উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিলেন যে, উক্ত রাস্তা আমার স্বামী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহাতে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। সরকার যদি বাধা দেন, তাহা হইলে উক্ত রাস্তা বন্ধ করিয়া দিব।

আদালতের বিচারে কিন্তু রাণী রাসমণি হারিয়া গেলেন এবং

তাঁহাকে কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হইল। রাণী আদালতে অর্থদণ্ড দিলেন বটে, কিন্তু পরের দিন উক্ত রাস্তার দুধারে বেড়া দিয়া দিলেন। তাহাতে অপরাপর রাস্তার চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। এই বেড়া খোলা লইয়া সরকারের সঙ্গে রাণী রাসমণির গরম গরম অনেক বচসা হইল। অবশেষে সরকার জরিমানার অর্থ ফেরৎ দেওয়ায় রাণী বেড়া তুলিয়া লইলেন। প্রকাশ যে সেই ঘটনার পর হইতেই নাকি, পুলিশের আইন হইল যে, কোনও শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে পুলিশের অনুমোদন লওয়া প্রয়োজন।

রাণী রাসমণি ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের বহু অংশ অতিবাহিত করেন এবং প্রত্যেক তীর্থই তাঁহার দাক্ষিণ্যের স্পর্শ পাইয়াছে। সে সময় সুবর্ণরেখার তীর হইতে জগন্নাথ-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাইবার পথ মোটেই ভাল ছিল না, রাসমণি বহুব্যয়ে সুবর্ণরেখার তীর হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। পুরীর মন্দিরে গিয়া সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলরামের মস্তকে তিনি ষাট হাজার টাকা মূল্যের হীরক-মুকুট পরাইয়া দেন। এইরূপ বাঙ্গালার বহু তীর্থ-ক্ষেত্রও রাণী রাসমণির দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিবে।

তিনি যখন স্বগ্রামে যান, তখন সেখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অনুরোধে তিনি ৩৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া এক ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। আগে গঙ্গায় যে-সমস্ত ধীবর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিত, তাহাদের উপর একটা কর ধার্য্য ছিল। দরিদ্র ধীবরেরা ভাবিত, চির-প্রবাহমান গঙ্গার জলস্রোত সবারই জন্য; এই পুণ্য-ধারার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তাহারাই সাক্ষাৎ অনুচর। কিন্তু তাহারা দেখিল, তাহারাই এই স্রোতের অধিকার হইতে সব চেয়ে বঞ্চিত। কর তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা অনেক বড় লোকের কাছে ধন্না দিল, কিন্তু কোথাও কোন ফললাভ

হইল না। অবশেষে তাহারা রাণী রাসমণির শরণাগত হইয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিল। রাণী ধীবরদের দুরবস্থা দেখিয়া মেটিয়াবুরুজের সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গা বহু সহস্র টাকায় সরকারের নিকট হইতে স্বয়ং জমা লইলেন এবং গঙ্গার সেই অংশ ধীবরদের মাছ ধরিবার অবাধ অধিকার দিলেন। এই ব্যাপার অচিরেই সরকারের নজরে পড়িল এবং সরকার সেই সময় হইতে ধীবরদের উপর কর তুলিয়া দিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রাণী রাসমণি ইংরাজদের সাহায্য করেন, কিন্তু সেই সময় তাঁহার জানবাজারস্থ বাটী কতকগুলি ইংরাজ-সৈন্যদ্বারা লুণ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, অভদ্র গোরা-সৈন্যগুলির বর্ব্বরতা নিবারণ করিবার জন্য তিনি নিজহস্তে তরবারি ধরিতে গিয়াছিলেন। পরে অবশ্য সরকার এই অন্যায়ের প্রতিকার করেন।

কিন্তু রাণী রাসমণির জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা দক্ষিণেশ্বর যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন গঙ্গার তীর-বর্ত্তী সেই দ্বাদশ মন্দিরের চূড়া, পরমহংসদেবের পুণ্য-স্মৃতি-ভরা দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সেই বিরাট প্রাঙ্গণ, বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমৃত-সান্ত্বনা বিলাইবে এবং সেই সঙ্গে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির স্মৃতিও চিরজাগরূক হইয়া থাকিবে।

১২৬২ সালে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাণী রাসমণি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ সহ দ্বাদশটী মন্দির, আদ্যাশক্তি কালীমূর্ত্তি এবং রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গার ধারে সেইটুকু স্থান হিন্দুধর্ম্মের এক বিরাট সমন্বয়-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিল, তাহারা সকলেই এক অনাদি আদ্যাশক্তির ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আর এই সমন্বয়-বাদের সাধক হইলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব।

পরমহংসদেবের সাধনার সহিত রাণী রাসমণির জীবন একান্ত

ঘনিষ্ঠভাবে জড়ান। সামান্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালী ও শিবপূজায় নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি অন্তরে যতই ভাবাবেশ অনুভব করিতে লাগিলেন, বাহিরের আনুষ্ঠানিক কাজে ততই শৈথিল্য দেখা দিতে লাগিল। অন্তরে যখন মুক্তি আসিয়াছে, তখন বাহিরে বিধির বন্ধন কে মানিয়া চলিবে ? কিন্তু মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার এই সমস্ত ক্রটী গুরুতর অপরাধ বিবেচনায় তাঁহাকে পৌরোহিত্য হইতে বঞ্চিত করিবার কথা স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরোহিতের সেদিকে কোনও লক্ষ্য নাই। রাণী রাসমণি ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ জামাতা মথুরবাবুর কাণে সমস্ত ব্যাপার গিয়া উঠিল। রাণী রাসমণি অন্তর দিয়া বুঝিলেন যে, এ পুরোহিত সাধারণ পূজক নন, কোন মহা-সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ইঁহার মধ্য দিয়া প্রকটিত হইবে। পূজার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যখন বিশেষ ব্যাঘাত পড়িতে লাগিল, সেই সময় রাণী রাসমণি গদাধর পুরোহিতকে তাঁহার নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিলেন এবং পরে তাঁহাকে লইয়া তিনি পুনরায় ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই তীর্থ-ভ্রমণের সময় বহুদিন ভাবাবেশে পরমহংসদেব কখনও অজ্ঞান, কখনও উন্মাদবৎ হইয়া যাইতেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাণী রাসমণি পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরের সমস্ত অধিকার দান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সেই পবিত্র স্থানেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী এবং অতিথিসেবার জন্য রাণী রাসমণি ৬০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী দিয়া যান। এখনও পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র সহস্র দরিদ্র ভদ্র পরিবার এই মন্দিরের প্রসাদেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

এইরূপ পরিপূর্ণ কীর্ত্তি ও গৌরবের মধ্যে বঙ্গজননীর মহিয়সী দুহিতা

অসংখ্য লোককে সত্যই শোকাশ্রুতে ভাসাইয়া ১২২৭ সালের ৯ই ফাল্গুন রাত্রিশেষে দেহত্যাগ করেন।

গঙ্গার অমৃতকণাবাহী সমীরণ যতদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়া স্পর্শ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাণী রাসমণির পুণ্যস্মৃতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরজাগরূক হইয়া থাকিবে।

# বিআম্মা বেগম

বিআম্মা বেগম—নাম নয়, উপাধি। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই নারীকে আপনাদের জননীর'মত সম্মান করিত, এবং এই মহিয়সী নারী সমস্ত ভারতবাসীকে আপনার দুই সন্তান শওকাৎ আলী ও মোহাম্মদ আলীর মতন দেখিতেন বলিয়াই, ভারতবর্ষ শ্রদ্ধায় তাঁহাকে ভারতের জননী অথবা বিআম্মা বেগম বলিয়া ডাকে।

আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারত-নারী দেশের মুক্তি-সংগ্রামে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, গর্ব্বোদ্ভাসিত-আননে কারাবরণ করিয়া ভারতের গৃহলক্ষ্মীরা আজ তাঁহাদের কল্যাণস্পর্শে কারাগারকে মন্দিরে পরিণত করিয়াছেন, শুধু হিন্দু-রমণীগণ নয়, একান্ত পর্দ্দানশীন মোসলেম-রমণীও আজ পর্দ্দা-উন্মোচন করিয়া জয়-যাত্রায় পুরুষের পথের সাথী, কারাগারের সাথী হইয়াছেন। ভারতে নারী-জাগরণ যে আজ সফল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রথম প্রেরণা ভারত-নারী পায়, বিআম্মা বেগমের নিকট হইতে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন এবং মহাত্মাজী স্বয়ং এই মহিয়সী নারীর স্নেহ-পুষ্ট। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যখন উদগ্র, তখন এই তেজস্বী মোসলেম রমণী,

যুগ-যুগ সঞ্চিত সমস্ত লোকাচার, সমাজের সমস্ত প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধক দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া, পর্দ্দা-বিমুক্ত হইয়া আপনার দুই সিংহতুল্য সন্তানকে স্বহস্তে স্বাধীনতার সংগ্রামে পাঠাইয়া দিয়া, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রথম জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিআম্মা বেগম এক অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ নওয়াব শামসুদ্দীন মোগল দরবারের সর্ব্বশেষ উজীরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ( ১৮৫৭ ) তাঁহার বয়স পাঁচ কি ছয় ছিল। তাঁহার শৈশবকে ঘিরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের সমস্ত ঘটনা ঘটে এবং এই বিদ্রোহে তাঁহার বংশ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন।



বিদ্রোহের পর রামপুরের নওয়াবের নিকট হইতে তাঁহারা বৃহৎ জায়গীর উপহার পান। তাঁহাদের সম্পত্তির সহিত এই বৃহৎ জায়গীর সংযুক্ত হওয়ায় তাঁহারা সেই সময়কার একজন বিশেষ ধনী পরিবার বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় যখন খিলাফৎ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করেন, রামপুরের নওয়াব উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

১৮৮০ সালে বিসূচিকা রোগে যখন সহসা আলীভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার মাত্র আঠাশ বৎসর বয়স। নাবালক পুত্রদের লইয়া তিনি স্বয়ং সংসার দেখিতে লাগিলেন এবং সাংসারিক নানা গণ্ডগোলে নানাদিক হইতে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিলেন।

সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের নিকট পরিত্যাজ্য ছিল। ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করাকে তাঁহারা পাপ বলিয়া মনে করিতেন এবং কোনও সম্ভ্রান্ত-বংশের ছেলে যদি ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে লোকচক্ষে সেই বংশ অত্যন্ত হেয় হইয়া যাইত। এই অবস্থায় বিআম্মা বেগম তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরাজী-শিক্ষা দিবার মানস করিলেন এবং সকলের তাচ্ছিল্য মাথায় পাতিয়া লইয়া দুই পুত্রকে প্রথমে বেরিলী, তারপরে আলীগড় কলেজে শিক্ষাদান করেন।

ইংরাজী শিক্ষার সম্বন্ধে রামপুরে সেই সময় লোকে কি ধারণা পোষণ করিত, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া মওলানা মোহাম্মদ আলী এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আমাদের বালককালে রামপুরে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এক মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট একখানি টেলিগ্রাম আসে। গ্রামের সমস্ত মুরুব্বীরা এক জোট হইয়া প্রথমে ঠিকই করিতে

পারিলেন না যে ব্যাপারখানা কি। ইহাতে কি লেখা আছে, তাহাও বা কেমন করিয়া জানা যায়! কেহই তো ইংরাজী জানে না। অবশেষে আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের নাম করিয়া বলিলেন, ওদের কাছে নিয়ে গেলেই বোঝা যাবে—ছেলে দুটো ইংরেজী পড়ছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র সেই ভদ্রলোকটী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি বল হে, তারা যে ভদ্র ঘরের ছেলে, তারা কেন ইংরেজী শিখবে? আমরা ভদ্রলোক হইলেও রামপুরের বুকে বসিয়াই ইংরাজী শিক্ষা করিতাম।"

বিআম্মা বেগম দুই ভ্রাতাকে দুই সিংহ-শিশু করিয়া গড়িয়া তোলেন। খিলাফৎ-আন্দোলনের সময় যখন আলী-ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় পুত্রদের সঙ্গে জননীও সংগ্রামে নামিয়া আসিলেন এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় একবার চিন্দ-ওয়ারার মামলায় আর একবার করাচীর মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আলী-জননী হাসিতে হাসিতে দুই পুত্রকে কারাগারে প্রেরণ করেন। যখন শুনিলেন যে, কারাগারের মধ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত সরকারের আপোষ মীমাংসার কথা হইতেছে, তখন এই বীরনারী বলিয়াছিলেন, "যদি তাহারা কোনও অসম্মানজনক সর্ত্তে নিজেদের মুক্তি-ক্রয় করে, তাহা হইলে এই বাহুতে তাহাদের দুইজনকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার শক্তি আমার এখনও আছে।"

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলনে তিনি পরিপূর্ণভাবে যোগদান করেন এবং মহাত্মাজীকে তিনি আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনে এই নারী পরিণত বার্দ্ধক্যে পুনরায় ভারতের নানাস্থানে তাঁহার অগ্নিময় বাণী ছড়াইয়া বেড়ান। ১৯২১

সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোরের এক সভায় তিনি বলেন, "আজ আমি আমার মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছি আমি মনে করি, সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার মোহাম্মদ ও শওকতের ন্যায় পুত্র-সদৃশ। আমি চাই আমার সন্তানরা যেন একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় না করে। কারাগার, ফাঁসীর কাষ্ঠ তো তুচ্ছ! দুই পুত্র কারারুদ্ধ, কিন্তু আমার কোটী কোটী পুত্র আমার চারিদিকে।"

আজ বিআম্মা নাই। ভারতের নারী-শক্তির মূলে তিনি যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ দিকে দিকে নানারূপে জাগিয়া উঠিতেছে। অনেকের বিশ্বাস তিনি জীবিত থাকিলে, আলী-ভ্রাতৃদ্বয় বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না।

# সরোজিনী নাইডু

ভারতের গৌরব বাঙ্গালীর মেয়ে সরোজিনী নাইডু এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় যখন রাজ-রোষে অন্যান্য শত শত সহকর্ম্মী নারী ও পুরুষের সহিত বৃটীশ কারাগারে আবদ্ধ, তখন তাঁহাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক কারাগারে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কারাগারের নিয়মানুসারে বন্দীদের সহিত বাহিরের লোক যখন কথা বলে তখন কর্ত্তৃপক্ষের একজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারই সম্মুখে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিতে হয়। উক্ত ভদ্রলোকটী যখন শ্রীমতীদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় জেল-কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি-স্বরূপ যে মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া

ভদ্রলোকটী বলেন, আপনাদের জেলে দেখিতেছি জগতের সব চেয়ে সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে! সম্মুখের পুষ্পোদ্যানের দিকে চাহিয়া আনন্দে জেল কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি রমণীটী বলিলেন, আপনি কোন্ ফুলগুলির কথা বলিতেছেন? ভদ্রলোকটী পুষ্পোদ্যান হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া সেই দুইটী বন্দিনী নারীর দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া উত্তর দিলেন—"আমি এই ফুলগুলির কথা বলিতেছিলাম!"

ভারতের পুষ্পোদ্যানে আজ ফুলের মরশুম লাগিয়াছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাহারই মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি পুষ্প।

বাঙ্গালার এ ফুল কিন্তু বাঙ্গালার পুষ্পোদ্যানে ফোটে নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই



ফেব্রুয়ারী নিজাম-রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহরে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মাতার নাম শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী স্বদেশ হইতে বাহিরে গিয়া আপনার প্রতিভার বলে অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গালার বাহিরে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয় বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রতিভা যুগ-বিরল।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় ব্রাহ্মণগ্রামের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশে ১৮৫১ সালে অঘোরনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যোগ্যতার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ডের গিলক্রাইস্‌ট বৃত্তি লইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস, সি, পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ব্যাকস্‌টার পুরস্কার লাভ করেন। তাহার পর প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রসায়নবিজ্ঞানের বহু-আকাঙ্ক্ষিত "হোপ" পুরস্কার পান। সেই প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনের কয়েকটী অধ্যাপক ও যোগদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এইরূপ সগৌরবে পাঠ-সমাপন করিয়া অঘোরনাথ জার্ম্মাণীর 'বন্‌' বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ভাযরথের নিকট স্ফটিকতত্ত্ব, অধ্যাপক ক্লসিয়াসের নিকট উত্তাপ ও বিদ্যুৎ, অধ্যাপক কেকুলের নিকট জৈব-রসায়নের বিশেষ বিভাগে গবেষণা করিয়া পুনরায় এডিনবরায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে ১৮৭৭ সালে ডি, এস-সি, উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষে তখন হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তার

ও শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন। অঘোরনাথের অসামান্য প্রতিভার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আহ্বান করিলেন অঘোরনাথ আনন্দে সেই ভার গ্রহণ করিলেন। নিজাম-কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে হায়দ্রাবাদের বিভিন্নস্থানে বালকবালিকাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বিদেশে বাঙ্গালী অঘোরনাথ সর্ব্বসাধারণের নিকট "শিক্ষা-গুরু" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার গৃহ নিজাম-রাজ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। বিদ্যাবত্তা ব্যতীত তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবীর সহৃদয়তাও নিজাম-রাজ্যে সুবিখ্যাত।

এই রকম শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে অঘোরনাথের আটটি পুত্রকন্যা বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং আজ তাঁহারা প্রত্যেকেই জীবনের এক এক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা লিখিতেছি, এবং যাঁহার নাম এবং কীর্ত্তি আজ ভারতবর্ষ হইতে সুদূর আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তিনি হইতেছেন বংশের প্রথম সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্রনাথ ভারতকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার অপরাধে ১৯০১ সালে একুশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হন এবং আজও ভারতের বাহিরে তিনি নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন এবং য়ুরোপীয় সাম্যবাদী-দলে যোগদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ নিজাম সরকারের সহকারী রাজস্ব-সচিব ছিলেন; তৃতীয়পুত্র রণেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়া কন্যা সুনলিনী দেবী—এ, এস্ রঞ্জন্ মহাশয়ের পত্নী। তৃতীয়া কন্যা মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় সসম্মানে কেম্ব্রিজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিখ্যাত "শামা" পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেছেন। চতুর্থ পুত্র হারীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত গায়ক ও কবি। তাঁহারই স্ত্রী কমলা চট্টোপাধ্যায় আজ দেশ-নায়িকা। কনিষ্ঠা কন্যা

শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী বার্লিনে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ এণ্ড ট্রেড রিভিউ অফ এশিয়া" পত্রিকার সম্পাদক। এই প্রকার কৃতিবংশ খুব কমই দেখা যায়।

কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অঘোরনাথ শৈশব হইতেই সরোজিনীর জন্য একজন ইংরাজ ও একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রাখেন। তাঁহারা বাড়ীতে উর্দ্দুতেই কথা কহিতে শেখেন এবং বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে তিনি ফার্সী গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে সরোজিনী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময়ই তিনি ইংরাজী, ফরাসী, ফার্সী ও উর্দ্দু সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি সমস্ত ইংরাজ কবিদের কাব্য পড়িয়া শেষ করেন।

ইংরাজ-কবিগণ সেই কিশোরীর চিত্তে অভিনব কাব্য-পিপাসা জাগাইয়া তোলে এবং সেই বয়স হইতেই সরোজিনী ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। আজ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁহার আসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজী সাহিত্যে কাব্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে, শেষ-অধ্যায়ে এই বাঙ্গালী রমণীর অপরূপ কাব্যের উল্লেখ করিতেই হইবে।

এই বিষয়ে পরে তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও সমালোচক আর্থার সাইমন্স্‌কে যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলেন, শৈশবে কবিতা লিখিবার জন্য মনে বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিতাম বলিয়া মনে হয় না। তবে আমি স্বভাবতঃই কল্পনা-প্রবণ। বাবা আমাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু যে কবিত্ব শক্তি আমি তাঁহার ও আমার মায়ের (উভয়েই কয়েকটী চমৎকার গীতি-কবিতা রচনা করেন) নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এগারো বৎসর বয়সে একদিন

বীজগণিতের একটী অঙ্ক লইয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখি,একটী সম্পূর্ণ কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছি। সেইদিন হইতে আমার কাব্য-জীবনের সুরু হইল।"

এই সময় তিনি ইংরাজী ভাষায় একটী ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন। অঘোরনাথ কন্যার প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মুদ্রিত করেন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় নিজামকে উক্ত পুস্তকের একখানি উপহার দেওয়া হয়। নিজাম বাহাদুর বালিকার কাব্য-প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে যে-কোনও পুরস্কার দিতে সম্মত হন। সরোজিনী বিদেশ যাইবার জন্য একটী বৃত্তি প্রার্থনা করেন। নিজাম বাহাদুর বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ডের বৃত্তি দিয়া সরোজিনীকে সম্মানিত করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে সরোজিনী শিক্ষার্থীরূপে একাকী বিলাত যাত্রা করিলেন।[১] ইংলণ্ডে গিয়া ভারতহিতৈষিণী বিখ্যাত মিস্ ম্যানিংএর কর্তৃত্বাধীনে তাঁহারই বাটীতে থাকিবার সুযোগ পাইলেন। এই বাটীতে সেই সময় বহু সাহিত্যিক আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ডের সাহিত্যে আজ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এইখানেই বিখ্যাত সমালোচক এডমণ্ড গস্, নাট্য-সমালোচক উইলিয়াম আর্থার, বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক উইলিয়াম হাইন্ম্যান প্রভৃতির সহিত সরোজিনীর ঘনিষ্ঠতা হয়।

ষোড়শ বর্ষীয়া বলিয়া সরোজিনী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইলেন না, কারণ অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে কাহাকেও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র করা হয় না। সুতরাং যতদিন না বয়স পূর্ণ হইল ততদিন পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনের কিংস্ কলেজে পড়িতে লাগিলেন। পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরা-বাঁধার মধ্যে তিনি চলিতে পারিলেন না, শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ঘুরিয়া

বেড়াইয়া তিন বৎসর পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং কাব্যচর্চ্চায় মনঃসংযোগ করেন। তিনি তিনখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তাহাদের নাম, গোল্ডেন থ্রেস্‌হোল্ড, বার্ড অফ টাইম্‌স্‌ ও ব্রোকেন উইঙ্গস্‌। এই তিনখানি কাব্য-গ্রন্থ কি দেশে, কি বিদেশে, তাঁহার কবি-প্রতিভাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি ডাক্তার মোতিআলা গোবিন্দরাজুলু নাইডু মহাশয়কে বিবাহ করেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল এবং নানা বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও এই অনুরাগ অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সাংসারিক জীবনে শ্রীমতী নাইডু মূর্ত্তিমতী কল্যাণী। তিনি আদর্শ-পত্নী এবং পুত্র-কন্যা পালনে তিনি আদর্শ-মাতা। সমস্ত সংসারকে তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা সর্ব্বদাই আনন্দমুখর করিয়া রাখেন।

শ্রীমতী নাইডুর কাব্য ও সাংসারিক জীবনের বাহিরে যে আর একটী বিশিষ্টরূপ আছে, সেইরূপেই তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। মুক্তি-কামী কোটী কোটী ভারতবাসীর নিকট আজ তিনি মূর্ত্তিমতী শক্তি। শৈশবের সমস্ত সুখ-ভোগ, যৌবনের সমস্ত কবি-কল্পনা ত্যাগ করিয়া আজ তিনি বাস্তব-জগতের সমস্ত ক্রূরতা ও বীভৎসতার মধ্যে বীর-নারীর মত নামিয়া আসিয়াছেন। যমানুসারিণী সাবিত্রী যেমন একদিন মৃত্যু-ভয়কে অতিক্রম করিয়া সত্যবান্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্যারূপে আজ তিনি তেমনি মৃত্যু-ভয়কে অতিক্রম করিয়া ভারতের হৃত-স্বাধীনতাকে ফিরাইয়া আনিতে চলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ভারতের সমগ্র নারী-চিত্তে তন্দ্রামগ্ন শক্তিরূপাকে জাগাইয়া তুলিতেছেন। কবির বীণায় একদিন ভারতের নারী সম্বন্ধে যে স্বপ্ন-রূপ জাগিয়া উঠে—আজ তাহা বাস্তবে সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

সরোজিনীকে দেশ-প্রেমে সাক্ষাৎভাবে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন ভারত-খ্যাত মহাত্মা গোখলে। সরোজিনীর অন্তরের পরিচয় পাইয়া তিনি একদিন অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়া তাঁহাকে বলেন,—

"আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, এই আকাশের নক্ষত্ররাজিকে ও অদূরে ঐ পর্ব্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রাখিয়া, হে কবি, তোমার শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গীত, বচন, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন দেশ-মাতার চরণে উৎসর্গ কর। হে কবি, কল্পনার সুমেরু-শিখরে আরোহণ করিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, আজ তাহার বার্ত্তা সকলের কাছে, সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছাইয়া দাও!"

আকাশের নক্ষত্র সাক্ষী, সাক্ষী হিমালয়, গোখলের সেই আহ্বান সরোজিনী বর্ণে বর্ণে জীবনে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। যে-চিত্ত গোখলের মন্ত্রে অনুরণিত হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীর দীক্ষায় আজ তাহা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

সরোজিনী যখন দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তখন নানাদিক দিয়া সংগঠন কার্য্যের বহু অসম্পূর্ণতা ও বাধা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানে তখন নিত্য বিরোধ, যেটুকু শক্তি কংগ্রেস আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, তাহাও মডারেট ও এক্স্ট্রিমিষ্ট দুই দলের সংঘর্ষে পঙ্গু হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। যে সমস্ত লোকের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার ফলে আজ জাতীয়-আন্দোলন একটী বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন সত্যকারের পথ খুঁজিয়া পান নাই। তবে তাঁহারা অনেকেই তখন ভারতের মুক্তির সত্যকারের পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। সরোজিনী সেই পথ-অন্বেষকদের দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৯১৩ সালে ২২শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টার জন্য মোসলেম লীগের বিখ্যাত অধিবেশন হয়—এই অধিবেশনে

হিন্দুমুসলমানের মিলনের যে চুক্তি হয়, তাহাই লক্ষ্নৌ প্যাক্ট নামে খ্যাত। এই সভায় সরোজিনী নাইডু সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার অধিকার পান। ১৯১৬ সালে লক্ষ্নৌতে স্যার এস্. পি, সিংহের ( পরে লর্ড ) সভানেতৃত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বরাজ-প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় শ্রীমতী বেশান্তের সভানেতৃত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। তাহার পর হইতে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া নারী-অভ্যুত্থানের জন্য বহু স্থলে অক্লান্ত ভাবে বক্তৃতা দিয়া বেড়ান এবং তাঁহার বক্তৃতার অসামান্য নৈপুণ্যের কথা ভারতের চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ১৯১৮ সালের মে মাসে কাঞ্জিভরমে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

বস্তুতঃ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীমতী নাইডু সমগ্রভাবে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার প্রাণময়ী বাণী সেই সময় হইতে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এক অভিনব জাগরণের প্রেরণা আনিয়া দেয়।

১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অভিনব অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া সরোজিনী সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ছায়ার মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন এবং যে আন্দোলনের ফলাফল সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে, শ্রীমতী নাইডু আজ সেই যুগান্তকারী আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক।

নারীদের ভোটাধিকার লইয়া তিনি প্রচুর সংগ্রাম করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধি রূপে তিনি ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর নিকট উপস্থিত হন এবং ১৯১৯ সালে অল ইণ্ডিয়া হোমরুল

লীগ্ এর তরফ হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্ট কমিটিতে দেশের জন্য আবেদন পেশ করিতে গিয়াছিলেন।

শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ায় ১৯২০ সালের প্রথম দিকে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেওয়াতে ভারত-সচিব তাঁহাকে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে বলেন। সরোজিনী কংগ্রেসের রিপোর্ট হইতে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। মালাবারের মোপলা-বিদ্রোহ লইয়া মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হয়। ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন কারারুদ্ধ হন, তখন শ্রীমতী সরোজিনী দ্বিগুণ উদ্যমে সারা ভারতবর্ষ মহাত্মাজীর বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান।

কেনিয়াতে শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর দুর্দ্দশার প্রতিকারার্থ তিনি ১৯২৪ সালে সুদূর আফ্রিকা যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা ও উৎসাহের ফলে প্রবাসী ভারতবাসীদের দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

সরোজিনী যখন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষে ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনাকে তিনি সেইদিন হইতে তাঁহার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আপনার ব্যক্তিত্ব ও বাণী দ্বারা এই মহাকার্য্যকে অনেকখানি সফল করিয়া তুলিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অফ লিটারেচর" উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি এ উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

১৯২১ সালে তিনি বোম্বে কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হন এবং

তাহার পর ১৯২৬ সালে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-মহাসভার সভাপতিত্বের মহাগৌরব তিনি অর্জ্জন করেন।

তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের সমস্ত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ভারতের এই নব অভ্যুত্থানের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবন অভিন্নভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উপযুক্তা শিষ্যার মত শ্রীমতী নাইডু, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করিয়া গুরু-নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য পালন করেন। দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, পথে, প্রান্তরে, পুলিশের গুলির সম্মুখে হাসিমুখে তিনি সত্যাগ্রহীদের পরিচালকের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সেই অপরাধে বৃটীশের কারাগারে আবদ্ধও হন।

নারীজাগরণের যে-বাণী এক যুগ ধরিয়া তিনি প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা সফল লইয়া উঠিয়াছে। যে হিন্দু-নারীকে সূর্য্য-করও দেখিতে পাইত না, আজ তাঁহারা পুলিশের লাঠীর সম্মুখে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ভারতের সন্তানের পার্শ্বে আজ ভারতের কন্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, শিশুপুত্র সহ মাতা আজ কারাগারে যাইতেছেন, ভ্রাতার সহিত ভগ্নী, পিতার সহিত কন্যা, স্বামীর সহিত সহধর্ম্মিণী আজ কারারুদ্ধ।

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীমতী সরোজিনী বলেন, "আমি আশা করি, নির্ব্বাসিতা সীতা বা যমানুসারিণী সাবিত্রী যে শক্তিবলে অরণ্যে বা যমালয়েও নিশ্চিন্তভাবে যমরাজের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই, সেই শক্তির কণামাত্রও যদি পাইয়া থাকি তবে আজ আপনাদের আরোপিত কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব।"

আজ দেখি, ভারতের প্রতি প্রদেশ দিয়া যমানুসারিণী সাবিত্রী চলিয়াছে, অপহৃত-প্রাণ সত্যবানকে ফিরাইয়া আনিতে।

# অ্যানী বেশান্ত

এখন ১৯৩১ সাল। অ্যানি বেশান্ত জন্মগ্রহণ কবেন ১৮৪৭ সালের *১লা অক্টোবর। এই ৮৩ বৎসর কাল ধরিয়া, অর্থাৎ একটি পূরা শতাব্দীর সমস্ত উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সাক্ষাৎভাবে অ্যানি বেশান্তের নাম বিজড়িত। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তিনি জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন, পরে তাহাকে লালন পালন করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক মত-বাদের প্রতিক্রিয়ারূপে ইংলণ্ডকে নাস্তিক্যবাদে প্রথম প্লাবিত হইতে দেখিয়াছেন এবং সে প্লাবনে তিনিও একটি তরঙ্গ হইয়া যোগদান করিয়াছেন; রাজতন্ত্র শাসিত ইংলণ্ডে



সাম্যবাদী দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছেন, সেই সঙ্গে তিনিও তাঁহার সভ্য হইয়াছেন ; পাশ্চাত্য শিক্ষায় সম্মোহিত হইয়া ভারতবর্ষ যখন তাহার সনাতন আদর্শ ভুলিয়া পশ্চিমের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতেছিল, এবং যখন সবার অগোচরে পাশ্চাত্য কালচারের নিঃশব্দ আক্রমণে হিন্দু কালচার লোপ পাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় পশ্চিমের এই কন্যা ভারতবর্ষ ও তাহার আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়া সম্মোহিত ভারতবাসীর চিত্তকে তাহার পুরাতন আদর্শের দিকে পুনরায় ফিরাইয়া আনেন। অ্যানি বেশান্তের প্রভাব ব্যতিরেকে বোধহয় গত শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করিয়া মাদ্রাজে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মদিরা-সিক্ত অন্তর যখন জাতির পুরাতন আদর্শ ভুলিয়া নূতন কিছুই ধরিবার না পাইয়া অবিশ্বাসের মধ্যে পাশ্চাত্যের ক্ষণিকবাদকেই আশ্রয় করিতেছিল, সেই সময় অসামান্যা প্রতিভাশালিনী এই রমণী সেই সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর সম্মুখে ভারতের সনাতন আদর্শের অনুকূল একটী নূতন ভাবরূপের সন্ধান আনিয়া দিলেন। আজ হয়ত সে আদর্শ ও ভাবরূপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার মনোবৃত্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেদিন এই মনোবৃত্তিকেই অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং অ্যানি বেশান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটী পরিপূর্ণ ভাবে সেই প্রয়োজন সংশাধিত করিয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অ্যানি বেশান্তের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং অনির্ব্বাণ উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা ব্যতিরেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহগ্রস্ত ক্ষণিকবাদবিলাসী গত যুগের ভারতীয় শিক্ষিতদের চিত্তকে দয়ানন্দ,অথবা কেশব সেন,রাণাডে অথবা কেহই এরূপ ব্যাপকভাবে প্রতিহত করিতে পারিতেন না।

অবশ্য একথা সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রীমতী বেশান্ত হিন্দু-দর্শন ও

ক্রিয়াকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া সকলের গ্রাহ্য না হইতে পারে ; ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি সব সময় সন্দেহাতীতরূপে প্রকট না হইতেও পারে ; ইদানীং কৃষ্ণ-মূর্ত্তির ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিত্বের গৌরব অনেকের কাছে হ্রাস হইয়া যাইতেও পারে,তথাপি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গত শতাব্দীতে যে সমস্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অ্যানি বেশান্ত আপনার দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন কর্ম্ম ও অসামান্য প্রতিভার বলে তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার স্থায়ী আসন করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

আইরিশ মাতার গর্ভে ও ইংরাজ পিতার ঔরসে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে কুমারী উড (পরে অ্যানি বেশান্ত) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উইলিয়াম পেজ উড লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারীশাস্ত্র ব্যতিরেকে দর্শন ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বাল্যে কুমারী উড সঙ্গীত এবং য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। বিখ্যাত ইংরাজ নভেল-লেখক ক্যাপ্টেন মারায়াটের ভগ্নীর সহিত কিশোর কালে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি হয় এবং সেই সময়েই তিনি জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

য়ুরোপ পরিভ্রমণ শেষ করিয়া যখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার ঘটনা-বহুল দীর্ঘ জীবনের সূত্রপাত ঘটিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মিঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত নামক এক ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহ হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা বদলাইয়া গেল। রেভারেণ্ড বেশান্তের সহিত তাঁহার অন্তরের কোনও মিল হইল না। দুইজনার প্রবৃত্তি, মনোবৃত্তি, শিক্ষা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হওয়ার দরুণ তাঁহাদের বিবাহিত জীবন বিষাদপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এখানে অ্যানি বেশান্তের চরিত্রের মূলগত বিশেষত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি যেমন এক অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী, ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার যেন দেহগত স্বধর্ম্ম, তেমনি গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ও তাঁহার মনের স্বধর্ম্ম। যে-তত্ত্ব বা যে-আদর্শ যখনি তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তখনি মনের সমস্ত আবেগ ও অনুরাগ-প্রাবল্য দিয়া তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। সেই আদর্শের অনুযায়ী বাহিরের ও ভিতরের সকল জিনিষকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু মত ও বহু আদর্শের আবর্ত্তের মধ্য দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখনি যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তখনি সে আদর্শের চরম-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

বিবাহের যৌন-সম্বন্ধের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। তাই বিবাহের পর সহসা অন্তরের সেই বিতৃষ্ণার সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাঁহার আদর্শবাদী মন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি সমস্ত চিত্তকে সংহত করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন।

সেই সময় ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক নূতন স্বাধীন মতবাদের প্রসার হইতেছিল। মানুষ ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব, এমন কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে শিখিতেছিল। নব-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞান এই নাস্তিক্য-বাদের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতেছিল। মিলের দর্শন তখন সমগ্র চিন্তাশীল ইংলণ্ডকে এই নব সন্দেহবাদে দীক্ষিত করিতেছিল। এই সময় অ্যানী বেশান্তের জীবনের চারিদিকে নানাপ্রকারের অশান্তি ও বিপত্তি জমা হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাঁহার ভাব-প্রবণ চিত্তে সেগুলি শতগুণ-বর্দ্ধিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। শৈশব হইতে মাতৃ-স্নেহে বর্দ্ধিত হওয়ায়, মাতার প্রতি তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। ঋণ-দায়ে সেই মাতাকে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইল; নিজেরও

জীবনে আদর্শগত ও ব্যবহারগত নানারূপ অশান্তি দেখা দিল। এই সমস্ত দুঃখ বা সাংসারিক তিক্ততা সাধারণ চিত্তে কোনও রেখাপাত করে না— একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া তাহারা এই সমস্ত বিরূপ অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু এক-প্রকারের আত্ম-কেন্দ্রিক ভাব-প্রবণ চিত্ত আছে, যাহারা সামান্য বিরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইলেই বিচলিত হইয়া উঠে এবং সেই সামান্য ঘটনাটুকু এত বড় হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যে, সেই ক্ষণিক ঘটনাই তাহাদের সমস্ত আদর্শের বিচারের মানদণ্ড হইয়া উঠে। অ্যানী বেশান্তের মন ছিল ঠিক এই ধরণের। এই সময় তাঁহার একমাত্র শিশু-কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কন্যার মৃত্যু তাঁহার চিত্তকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল। চারিদিকে যদি যন্ত্রণা, যদি মৃত্যু, যদি জীবন-যাপন করার দুঃসহ গ্লানি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিবে, তবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব কোথা? কন্যার মৃত্যুর এই সূত্র বাহিয়া তাঁহারা অনুরাগ-প্রবল চিত্ত বিশ্বের মূলগত সমস্যা সমাধানের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল। ঈশ্বর যদি না থাকে, তবে কেন এই মিথ্যার বোঝা বহিয়া বেড়াই? তবে কেন নিত্য এক মূর্ত্তির সম্মুখে নত-জানু হইয়া বসি? তবে কেন আপনার ক্ষুদ্রত্বকে আরও ক্ষুদ্র করিয়া যে নাই, তাহার কাছে, জীবনের ব্যাধির প্রতিকারের ঔষধ চাই?

মিসেস্ স্কট বলিয়া তাঁহার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁহারই বাড়ীতে সেই সময়কার ইংলণ্ডের নাস্তিক্যবাদের প্রবর্ত্তকগণের আড্ডা বসিত। অ্যানী বেশান্ত সেই দলে আসিয়া যোগদান করিলেন এবং বৈজ্ঞানিক জড়বাদের অন্যতম প্রচারক চার্লস্ ব্রাডলওর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হইল। ব্রাডলওর দীক্ষায় তিনি মিল্, বেন্থাম্ স্পেন্সারের গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইলেন এবং বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদের প্রচারের জন্য সর্ব্বান্তঃ-করণে সকল শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

গির্জ্জায় যাওয়া বন্ধ হইল, নতজানু হইতে তাঁহার সর্ব্বদেহ-মন বিপ্লবী হইয়া উঠিল ; স্বামীর সহিত সংঘর্ষ আরও তিক্ত হইতে লাগিল। যে আদর্শ তিনি বিশ্বাস করেন না, বাহিরের কোনও সুবিধার জন্য, নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচরণ করিয়া সেই মত জীবন-যাপন করাকে তাঁহার অপরাধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ১৮৭৩ সালে তিনি আইনত স্বামীর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহার পর-বৎসর তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়-স্থল তাঁহার মাতাও পরলোক গমন করেন। মাতার লোকান্তর-প্রাপ্তির সহিত তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মের সহিতও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া তিনি মিসেস্ স্কটের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সুরু হইল। জগতের একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে আজ অ্যানি বেশান্ত যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রথম শিক্ষা হয়, এই চিন্তার স্বাধীনতা প্রচার কল্পে বিভিন্ন বক্তৃতায়। প্রথম প্রথম এই সমস্ত বক্তৃতায় তাঁহাকে সবিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, ইষ্টক-প্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আদালত পর্য্যন্ত বহু বিপত্তি সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহার স্বাধীন চিন্তার অধিকার পাইবে না, যে কথা সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকে মানিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, মনুষ্যত্বের বিকাশের এত বড় প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সেদিন ইংলণ্ডে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে এই নির্ভীক নারীর কণ্ঠস্বর ইংলণ্ডের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি এই স্বাধীন মতবাদের আদর্শ প্রচার

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আধার-আকাঙ্ক্ষী মন এই নেতিবাদে বহুদিন সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিল নাই। যে সময় তাঁহার আশ্রয়প্রবণ চিত্ত একটা আধারের অন্বেষণ করিতেছিল, সেই সময় ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কি ও কর্ণেল অলকট "থিওসপিক্যালে সোসাইটী" প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা নূতন ভাব-তন্ত্রের প্রচার করিতেছিলেন। নাস্তিক্যবাদ হইতে এই নূতন পারলৌকিক্ক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করার মধ্যে অ্যানী বেশান্তের জীবন নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। নিম্নে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির একটা তালিকা দেওয়া হইল,—

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট সাধারণ বক্তৃতা-মঞ্চে তিনি সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। এই সময় তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক ("French Revolution") "ফরাসী-বিপ্লব" বাঁহির হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের ন্যাশান্যাল সিকিউলার সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হন। চার্লস ব্রাডল ইহার সভাপতি ছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ন্যাশানাল রিফর্ম্মার নামক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হন। উক্ত সালে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে "Knowl ton Pamphet" পুনঃপ্রকাশ করার অপরাধে চার্লস্ ব্রাডলর সহিত তিনিও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহারা জয়লাভ করেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে Malthusean League প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যানী বেশান্ত উক্ত লীগের সেক্রেটারী হন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সহিত ভারতীয় রাজনীতির যোগসাধন হয়। উক্ত সালে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে তীব্র সমালোচনা করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পুস্তক "England, India and Afganisthan" প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত ১৮৭৯ সালে তিনি বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক আভেবারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং উক্ত বৎসরেই তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ কেনসিংটন কলেজে বিজ্ঞানের আটটী বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

১৮৮০ সালে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টকে তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি "Co ercion in Ireland and its result" নামক পুস্তিকা বাহির করেন। আয়ারল্যাণ্ডে বৃটীশনীতির প্রতিবাদে তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। সেই সময় বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের মিশরীর নীতির সমালোচনা করিয়া "Our shameful Egyption Policy" বাহির করেন। ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড ও মিশর সম্বন্ধে বৃটীশ-নীতির এই প্রতিবাদে সমগ্র ইংলণ্ড ও সংলগ্ন উপনিবেশগুলির দৃষ্টি সহসা এই নারীর উপর নিপতিত হইল।

১৮৮৩ সালে অ্যানি বেশান্তের সম্পাদিত প্রথম কাগজ "Our Corner" প্রকাশিত হয়। এই কাগজে বার্ণার্ড শ', হেকেল প্রভৃতি সেই সময়কার বিখ্যাত ইংরাজ লেখকগণ নিয়মিতভাবে লিখিতেন। এই সময় অ্যানী বেশান্ত বার্ণার্ড শ'র মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি বিখ্যাত ফেবিয়ান সোসাইটীতে একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে যোগদান করেন। ইংলণ্ডে সাম্যবাদ প্রচারের জন্য এবং শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি গভীরভাবে প্রচার কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাকে ইংরাজ সাংবাদিকদিগের নিকট হইতে বহু বিদ্রূপ ও কঠোর ব্যঙ্গ সহ্য করিতে হয়।

ইংলণ্ডে সাম্যবাদের সেই প্রথম অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ শ্রমিকদের শোভাযাত্রা করার অপরাধে গ্রেফ্তার করিত এবং পুলিশের কথাতেই তাহাদের কারাদণ্ড হইত। এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্য

অ্যানী বেশান্ত "Socialist Defence Association" প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য তিনি নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন এবং শ্রমিকদের জন্য "The Link" নামক আর একখানি কাগজ বাহির করিলেন।

১৮৮৯ সালে অ্যানী বেশান্তের সহিত থিওসপিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮৯ সালের ১০ই মে তিনি থিওসপিক্যাল সোসাইটীর সভ্য হন এবং সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন-সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। ব্লাভাটাস্কীর মৃত্যুর পর তিনি উক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন।

এই মতবাদ গ্রহণ করার পর তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান, "The Ancient Wisdom, Study in Consciousness, Theosophy and the New Psychology, The Story of the great War, Ramchandra, The ideal King, Bhagavat Gita, Religions of India, Autobiography."

১৮৯৮ সালে হিন্দু কালচার প্রচারের জন্য অ্যানী বেশান্ত ভারতবর্ষে আসিয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করেন এবং ভারতের অনেক রাজা মহারাজার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য আদায় করেন। এই হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই বেনারসের বর্ত্তমান হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯১০ সালে কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং নিত্যানন্দ নামক দুইটী ব্রাহ্মণ-বালককে তাহাদের অভিভাবকদের নিকট হইতে পোষ্যরূপে অ্যানী বেশান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে উক্ত পুত্রদ্বয়ের পিতা তাঁহার তত্ত্বাবধান হইতে

পুত্র দুইটীকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আদালতে নালিস করে। চার বৎসর ধরিয়া এই মামলা চলে। এখানকার আদালতে পরাজিত হইয়া অ্যানী বেশান্ত প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করেন। সেখানকার বিচারে পুনরায় তিনি উক্ত বালকদ্বয়ের অভিভাবকত্বের সমস্ত অধিকার পান। বালক কৃষ্ণমূর্ত্তিকে ইদানীং জগতের ত্রাণ-কর্ত্তারূপে প্রচারিত করা হয়।

১৯১৩ সাল হইতে তিনি ভারতীয় রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন এবং ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জনমতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য Commonweal নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। মাদ্রাজের লিবারেল পার্টির পক্ষ হইতে "The Citizen" বাহির হওয়ায় অ্যানী বেশান্ত Commonweal বন্ধ করিয়া দিয়া "New India" নামক দৈনিক কাগজ বাহির করেন। ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য যে কয়েকখানি সংবাদপত্র এই শতাব্দীর প্রথমে সংগ্রামের তূর্য্য-ধ্বনি রণিয়া তোলে, তাহাদের মধ্যে অ্যানী বেশান্তের New India বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন, অ্যানি বেশান্তের ভাষায় "হোম-রুল" প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করিলেন। অ্যানী বেশান্তের প্রচার কার্য্যের ফলে সেদিন ভারত-সমস্যা আবার সারা জগতের সম্মুখে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের সম্মুখে বড় হইয়া দেখা দিল। ১৯১৬ সালে মাদ্রাজে তিনি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারা ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্যের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা ও আয়োজন করিলেন। তাঁহার নাম তখন ভারতের জনসাধারণের নিকট একান্ত সুপরিচিত হইয়া উঠিল। অ্যানি বেশান্তের প্রচারকার্য্যের ফলে আর একটী জিনিষ হইল, ইংলণ্ডের লোকেরাও ভারত সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ হইয়া উঠিল।

নিউ ইণ্ডিয়ার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল। সহসা ১৯১৬ সালের ২৬শে মে প্রেস-য়্যাক্ট অনুযায়ী নিউ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে ২০০০৲ টাকা জামীন চাওয়া হইল।

এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। নিউ ইণ্ডিয়া ডিফেন্স্ ফণ্ড খোলা হইল—ভারতের চারিদিক হইতে তাহাতে সাহায্য আসিতে লাগিল। অ্যানি বেশান্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই তলবের বিরুদ্ধে আপীল করিলেন এবং রীতিমত মামলা চলিতে লাগিল। প্রেস-য়্যাক্ট তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে সভা সমিতি হইতে লাগিল। ভাইসরয়ের নিকট ডেপুটেশন পাঠান হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হাইকোর্টে তাঁহার মামলা টিকিল না—ভাইস্‌রয় ডেপুটেশনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হোমরুল-আন্দোলন ভারতের সর্ব্বত্র আরও গভীরভাবে ছড়াইয়া পড়িল। অ্যানি বেশান্তের লেখনী ও বক্তৃতা অবিরাম ধারায় অনল-বর্ষণ করিতে লাগিল।

১৯১৬ সালের ১০ই জুলাই বোম্বে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বোম্বে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া অনুজ্ঞা জারী করিলেন।

এই উপলক্ষে অ্যানি বেশান্ত লিখেন, "The more they try to strike me, the more resolved does India become to win freedom from such tyranny."

ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইলও তাই। উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে মধ্য-প্রদেশের সরকারও বোম্বে সরকারের পন্থা অনুসরণ করিলেন। অ্যানী বেশান্তকে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল। এই দমন-নীতিতে শ্রীমতী বেশান্ত কিছুমাত্র প্রতিহত হইলেন

না। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের সহিত যোগদান করিয়া তিনি আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া অ্যানী বেশান্ত একটী অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, "ভারতবর্ষ এখনও ইংলণ্ডকে ভালবাসে। তবে সে প্রেস-য়্যাক্টের ইংলণ্ড নয়, ক্রিমিন্যাল ল আমেণ্ডমেণ্ট আইনের ইংলণ্ড নয়; সে ক্রমওয়েলের ইংলণ্ড, হাম্প্-ডেন, পিমের্ ইংলণ্ড, মিল্টন শেলীর ইংলণ্ড! ভারতবর্ষ ভালবাসে সেই ইংলণ্ডকে যে ইংলণ্ড একদিন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ম্যাজিনীকে আশ্রয় দিয়াছিল, যে ইংলণ্ডের লোক ইতালীর মুক্তিদাতা বলিয়া গ্যারিবল্ডীকে প্রকাশ্যভাবে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিল।"

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর হইতে শ্রীমতী বেশান্ত কংগ্রেসের কার্য্যে সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিয়া ভারতের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার লেখনী হইতে পুস্তিকার পর পুস্তিকা বাহির হইতে লাগিল।

তাঁহার কার্য্যবিধি লক্ষ্য করিয়া মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দমন করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মাদ্রাজের গভর্ণর। তিনি অ্যানী বেশান্তকে ওটাকামণ্ডে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু যে কোনও কারণে উক্ত সাক্ষাৎকার হইল না। তখন লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড স্বয়ং মাদ্রাজে আসিয়া অ্যানী বেশান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন এই সাক্ষাৎকার হয়।

সাক্ষাৎকার শেষ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড বলিলেন, "মিসেস্ বেশান্ত, আমি আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনার সমস্ত গতিবিধি বন্ধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নাই।"

শ্রীমতী বেশান্ত বলিলেন, "ক্ষমতা আপনার হাতে। আপনার যাহা ইচ্ছা আপনি তাহাই করিবেন। কিন্তু একটা কথা বলিতে চাই, এই আঘাত ভারতে বৃটীশ প্রভুত্বের উপরেই পড়িবে।"

এই সাক্ষাৎকারের একঘণ্টা পরেই সমগ্র ভারতে দাবানলের মত এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, অ্যানী বেশান্ত ওটাকামণ্ডে ("ইণ্টারন্‌ড্") নজরবন্দী রূপে আবদ্ধ হইয়াছেন।

অ্যানী বেশান্ত তাঁহার এই অন্তরীণ-বাসের কথা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতেন। তাই তিনি একটী বিদায়-বাণী লিখিয়া যান, তাহাতে তিনি লিখেন,—

"ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া এবং নিঃশেষে মরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছি বলিয়া, বলপূর্ব্বক আমাকে নিস্তব্ধ ও বন্দী করিয়া রাখা হইল। অন্যায়ের সহায়তা করা অপেক্ষা সেই বেদনা-ভোগ করা শ্রেয়ঃ। সম্মান হারাণোর অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাণো শ্রেয়ঃ। আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু আমার অন্তরের গভীর বাসনা যে, মরিবার পূর্ব্বে যেন আমি ভারতকে স্বাধীনতা (হোমরুল) পাইতে দেখিয়া যাইতে পারি। যদি সেই স্বপ্নকে সত্য করিবার সাধনায় অণুমাত্র সহায়তা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। ভগবান্ ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, বন্দেমাতরম্।"

অ্যানী বেশান্ত যখন অবরুদ্ধ-অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, ভারতবর্ষে তখন ধীরে ধীরে জনগণ-মন সংক্ষুব্ধ করিয়া একটা বিরাট আন্দোলন নিদ্রা-অন্তে বাসুকীর মত মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। এতদিন ধরিয়া যে মোহ-নিদ্রায় এই কোটী কোটী লোক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বহুদিনের প্রচারের ফলে তাহারা নূতন সূর্য্যের আলোকে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারত-সমুদ্রের তীরে নবোদিত সূর্য্যের এই রক্তিমচ্ছটা ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছিলেন—

লক্ষ্য করিতেছিলেন, দিন দিন সেই সূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির গৌরব অর্জ্জন করিতে চলিয়াছে। তাই সেদিন ইংলণ্ড হইতে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ঘোষণা করিলেন যে, ভারতে শাসন-সংস্কার দেওয়া হইবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিবেন।

১৯১৭ সালের শেষ দিকে অ্যানী বেশান্ত মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-লাভের পর তিনি ভারতের যে নগরে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই নগরেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক মহা-সমারোহ হইয়াছে। মুক্তির পর কলিকাতা কংগ্রেসের তিনি সভাপতি মনোনীত হইলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যেদিন কলিকাতায় প্রবেশ করেন, সে দিনকার অভ্যর্থনা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন তাহা স্মরণে রাখিয়াছেন।

ইহার পর দুইটী ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত করিল—একটী মিঃ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কার এবং অপরটী জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। একদল মণ্টেগু-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারকে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিকূল বিবেচনা করিয়া তাহাকে বর্জ্জন করিল—আর একদল তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে সহায়তা করিল। শ্রীমতী বেশান্ত দ্বিতীয় দলে যোগদান করিলেন এবং এই শাসন-সংস্কারের দানকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুফল বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতি লইয়া এক মহাজ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হইতেছিল; তাহারই কিরণচ্ছটায় পাঞ্জাব হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। তাহার মহাদ্যুতির প্রকাশে অন্যান্য জ্যোতিষ্কেরা নিশা-শেষের তারকার মত ম্লান-প্রভ

হইয়া উঠিল। অ্যানী বেশান্তের প্রভাবও সেই সময় হইতে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে অহিংস আন্দোলনের অভিনব বাণী লইয়া মহাত্মা গান্ধীর অপরূপ অভ্যুদয় হইল।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দুমুসলমান শিখের মিলিত-রক্তের অভিনব অর্ঘ্য লইয়া ভারতে নব-যুগ আসিল। স্বাধীনতার নূতন সংজ্ঞা হইল—সংগ্রামের নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রীমতী বেশান্ত এই নূতন ধারার সহিত আপনার অন্তরের মিল পাইলেন না। তিনি প্রকাশ্যভাবে মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্ম-পন্থার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলেন। কিন্তু "Young India"র বাণী "New India"র ভাষাকেও মলিন করিয়া দিল।

সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অ্যানী বেশান্ত কংগ্রেসের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াও, কখনও কংগ্রেসের স্বপক্ষে, কখনও বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়া তাঁহার আদর্শমত ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনকেই সেবা করিয়া আসিতেছেন।

আজ নূতন যোদ্ধারা আসিয়াছেন—নূতন তাঁহাদের যুদ্ধনীতি; তবুও ভারত যেদিন স্বাধীন হইবে, পুরাতন যোদ্ধা বলিয়া যাঁহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন, সেদিন তাঁহারাও জাতির সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা পাইবেন এবং এ কথা নিশ্চিত, অ্যানী বেশান্তের নাম সেখানে সগৌরবে উচ্চারিত হইবে।

# নিবেদিতা

শাশ্বত ভারতের প্রাণময় বাণীকে বহন করিয়া নবযুগের ভাব-ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, সেদিন আয়ারল্যাণ্ডের এক দুহিতা সেই নবোদিত সূর্য্যের অমিত-কিরণের দিকে চাহিয়া, পুরাকালের তাপস-রমণীদের মত সেই মহাদ্যুতির অর্ঘ্যস্বরূপ আপনাকে নিবেদিত করেন। সেই দিন হইতে এই নারী ধ্যানে, জ্ঞানে, ব্যবহারে, চিন্তায়, স্বপ্নে, আপনাকে বিবেকানন্দের মধ্যে এবং বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেন। বিংশশতাব্দীর জনারণ্যের মধ্যে এই তপস্যা-সুন্দর নিঃশব্দ আত্মসমর্পণের তনু-বাক কাহিনী মানবের চিত্তাকাশে প্রভাতী-তারার মত অনাদিকালের অমৃত-আশ্বাস বহন করিয়া চিরদিন বিরাজ করিবে।

নিবেদিতা কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই, কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়েন নাই, ইতিহাসখ্যাত বীর-রমণীদের মত কোনও রাজ্য জয়ও করেন নাই, নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সংগ্রামে লিপ্ত হন নাই, বিংশশতাব্দীর সহস্র-মুখ সংবাদ-পত্রে নিত্য প্রচারিত হইবার মত কোনও ঘটনার সহিত তাঁহার নাম বিজড়িতও নয়। কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীর এক সামান্য ভাঙ্গা-বাড়ীতে কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের মধ্যে তাঁহার জীবন-নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া যায়। প্রান্তরবাহিনী নিঃশব্দ নদীর ক্ষীণ জলধারা যেমন তারার নিঃশব্দ উদয়ের ছন্দে প্রবাহিত হয়, নিঃশব্দে সূর্য্যকিরণ কখন তাহার

সমস্ত অন্তরকে রঞ্জিত করিয়া যায়, তাহার খবর যেমন কেহই রাখে না—তেমনি নিবেদিতার জীবন-ধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তায় আপনি পরিপূর্ণ হইয়া বহিয়া চলে। এই নিঃশব্দ তপস্যাই এক মহাসাধনার প্রতীকরূপে আজ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। নিবেদিতার কর্ম্ম-জীবনের একমাত্র পরিচয় বাগবাজারের একটী সামান্য বালিকা বিদ্যালয়—যাহার বাড়ী ভাড়া প্রত্যেক মাসে জোগাইতে তাঁহাকে অসীম কষ্টসহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি জগতকে দিয়া গিয়াছেন—তপস্যা-সমাপ্ত তাঁহার জীবনকে। মহা-কাব্যের মত—এক বৃহৎ ভাব-



রসের মত তাহাই অনাগত বহু মানবের চিত্তে নব-নব শক্তি ও কর্ম্ম-প্রেরণা যোগাইবে। অনেকে কাব্য রচনা করিয়া ধন্য হয়, কেহ কেহ আপনার জীবনকেই মহাকাব্যরূপে রচনা করে। সৃষ্টির এই দুই ধারাই মানব-ইতিহাসকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তোলে। নিবেদিতা শেষোক্ত ধারায় মানব-ইতিহাসের ঐশ্বর্য্যময় ভাণ্ডারে আপনার জীবন-মহাকাব্য দিয়া আর একটী মহামূল্য সম্পদ্ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতার পিতৃ-দত্ত নাম কুমারী মারগারেট নোবল। তাঁহার পিতা স্কটল্যাণ্ডবাসী—মাতা আয়ারল্যাণ্ডের দুহিতা। শৈশবেই কুমারী নোবল অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন এবং কৈশোরেই তিনি তিনটী ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই লণ্ডনের শিক্ষিত-মহলে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের কীর্ত্তির ভাণ্ডারে এই নারী আর একটা মহার্ঘ্য মণি-মকরত জোগাইবেন। কিন্তু ভবিতব্যতা তখন অন্য এক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত দিক হইতে তাঁহার জীবনকে আকর্ষণ করিতেছিল। সে খবর কুমারী নোবলও জানিতেন না। যেদিন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন—তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া এবং সেই তেজঃদীপ্ত মহা-আবির্ভাবের দিকে চাহিয়া বিদেশিনীর অন্তরতম দেবতা আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল, হে পরম দেবতা, হে দৈব-প্রেরিত, তোমারই জন্য তো বসিয়াছিলাম। হে উদার-অভ্যুদয়, হে পরম-আবির্ভাব! আজ হইতে এই দেহ, মন, আত্মাময় আমার সর্ব্বস্ব, হে গুরু, তোমাতেই নিবেদিত করিলাম। আমার রক্তে তোমার বাণী বাজিয়া উঠুক, তোমার দেশের

ধূলায় আমার স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়া উঠুক, তোমার সহস্র-কিরণে আমার এ ক্ষুদ্র দীপ-শিখার সত্তা বিলুপ্ত হউক্।

পরম-দেবতার আহ্বানে যোগী যেমন করিয়া সংসার, সমাজ, স্তুতি-খ্যাতি, ধন-অর্থ সমস্ত পিছনে ফেলিয়া ধ্যানের নির্জ্জনতাকেই বরণ করিয়া লয়, তেমনি করিয়া কুমারী মারগেট নোবল জীবনের প্রথম বিকাশ-মুখে, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, পাশ্চাত্য জীবনের সমস্ত মোহ জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ভারতে আসিয়া গুরুর চরণ-প্রান্তে আত্ম-নিবেদন করেন। যেদিন নব-সন্ন্যাসের অরুণরাগদীপ্ত জগতে গঙ্গাসমীরপুণ্য বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীরা এই বিদেশিনী তাপস-রমণীকে ভগিনী নিবেদিতারূপে গ্রহণ করেন—সেদিন হইতে তিনি সেই নামেই পরিচিত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সমর্পিতা নিবেদিতা—এই তাঁহার স্বাক্ষর।

নিবেদিতার এই আত্মসমর্পণ আমার নিকট মানব-ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব রূপক বলিয়া মনে হয়। এ যেন য়ুরোপের আত্মা ভারতের আত্মার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিশ্ব-সভ্যতার যে মহাভবিষ্যৎ এক দিন এই ভারত গড়িয়া তুলিবে—নিবেদিতার আত্মসমর্পণের এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত যেন তাহারই অগ্রকাহিনী।

বাঙ্গালায় আসিয়া নিবেদিতার অন্তরের বাসনা ছিল যে, বেলুড়মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সহিত তিনিও ব্রহ্মচারিণীরূপে সেইখানে গুরুর সান্নিধ্যে আপনার ধ্যানময় জীবন যাপন করিবার অধিকার পাইবেন, কিন্তু মঠের মধ্যে ব্রতধারিণী হইলেও নারী হওয়ার অপরাধে সেদিন নিবেদিতা স্থান পান নাই। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণ-ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাই তিনি হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। অন্তঃপুরচারিণী হিন্দুরমণীর

মত তিনি কলিকাতার বাগবাজারস্থ বসু-পাড়া পল্লীতে একটি সামান্য গৃহে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং স্থানীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য উক্ত বাড়ীতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

তাঁহার অসামান্য চরিত্র মাধুর্য্যের ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নিবেদিতা অতি অল্পকালের মধ্যে স্থানীয় রমণীদের চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন এবং হিন্দু-রমণীর অন্তঃপুর-জীবনের নানা সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া ব্যক্তিগতভাবে নানা উপায়ে সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানেরও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিধবা রমণীদের ঘরে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা হইতে নানা প্রকার অন্তরের জটিলতর সমস্যার মধ্যে পরমানন্দে নিবেদিতা আত্মাবগাহন করিলেন। ছোট ছোট কাজ, একটু সুন্দর ব্যবহার, প্রদীপের একটুকু স্নিগ্ধ আলো, তাহারই মধ্যে নিবেদিতা অন্তরের অমৃত-আহার্য্য খুঁজিয়া পাইলেন।

যে-প্রতিভা একদিন অনায়াসে একটা সমগ্র ভূ-খণ্ড আলোকিত করিত, যে-শক্তি একদিন আপনার বিকাশের গৌরবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে অবলীলাক্রমে তুলিয়া ধরিতে পারিত, তাহা যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া বোসপাড়ার একটী নগণ্য গৃহেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল—সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা একটা বৃহৎ অপচয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভারতের দর্শন-বাদ জীবনকে যে-দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছে তাহার আলোকে আধ্যাত্মিক জীবনের একটী আত্মসমাহিত মুহূর্ত্ত ব্যবহারিক জীবনের সহস্র দিনের কর্ম্ম-কোলাহলের বহু উর্দ্ধে। দর-নির্দ্ধারণ করিবার প্রথা ভারতীয় চিন্তাধারায় নাই এবং নিবেদিতা হিন্দুদর্শনের মূলতত্ত্ব মনপ্রাণ দিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আপনার জীবনকে সেই আত্মিকধর্ম্মের অনুযায়ী করিয়াই গড়িয়া তোলেন। তাই সেই ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিতে তাঁহার কোনও চিত্তক্ষোভ ছিল না। যে-ঋষি

আপনার তপঃপ্রভাবে তৃতীয় স্বর্গলোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে আরণ্যক নির্জ্জনতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ বজ্র-নির্ঘোষে সুপ্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া বলেন, "What the world wants to-day is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God. Who will go? Why should one fear? If this is true what else could matter? If it is not true, what do our lives matter? Awake, awake, great souls! The world is burning in misery, can you sleep?"

—আজ চাই সেই পুরুষ আর সেই নারী, যাহারা ঐ মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিবে—ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের আর কিছুই নাই। কোথায় সে পুরুষ? কোথায় সে নারী? কিসের ভয়? ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অন্য যাহা কিছু হউক, তাহাতে কি যায় আসে? যদি সত্য না হয়, তবে এই জীবনেই—কি লাভ? ধরণী আজ দুঃখ-দগ্ধা,—জাগো, জাগো, হে অমৃত-আত্মা!

স্বামীজির এই আহ্বানে প্রকৃতভাবে কাহার চিত্ত জাগিয়াছিল জানি না, কিন্তু এই বিদেশিনী নারী এই আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সূর্য্যোদয়ে যেমন করিয়া পৃথিবী জাগিয়া উঠে।

নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান পরিবারে এবং এমন এক যুগে ও দেশে, যখন বা যেখানে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ আত্মার রহস্যতত্ত্বকে যন্ত্রের ঘর্ঘর-ধ্বনির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবাইয়া দিতেছিল। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে নিবেদিতা সেই বিজ্ঞানের নিকটই প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু জন্ম হইতেই তিনি আপনার রক্তে আত্মার রহস্যধর্ম্মের

আহ্বান-ঈঙ্গিত লইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টান-জগতে তিনি পৌত্তলিক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া যখনই তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের বিপুল প্রাণ-প্রবাহময় রূপতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন, তখনই তাঁহার প্রবাসী চিত্ত বলিয়া উঠিল, এই তো তোমাকে পাইয়াছি, তোমার মধ্য দিয়া এই তো আমাকেই পাইয়াছি।

যে সহজাত অনুভূতি লইয়া আর্য্য-ঋষিরা রূপময় প্রকৃতির মধ্যে আত্মার পরমাত্মীয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর এই শত সন্দেহাকীর্ণ যুগে নিবেদিতা আপনার অন্তরে সেই সহজাত আদিম অনুভূতিটী লইয়া আসিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রের যুগে তিনি ছিলেন যেন সেই বিস্মৃত যুগের প্রবাসী আর্য্যকন্যা। তাই হিন্দুর দেব-দেবী, প্রকৃতির রূপ ও রূপককে তিনি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। নিবেদিতার কোনও পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার "হিন্দু রিভিউ" পত্রিকায় একদিনের একটী ঘটনা স্মরণে লিখেন, "একদিন বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে নিবেদিতার সঙ্গে বসিয়া তাঁহার অদ্ভুত ধরণের স্বদেশী 'কাপে' চা-পান করিতেছি। সহসা অপরাহ্নের আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুমুল ঝড় উঠিল। সহসা দেখিলাম, নিবেদিতার মুখের ভাবও সেই সঙ্গে কখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব আলোর আভাস ফুটিয়া উঠিল। আমি বেশ বুঝিলাম যে, আমি যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি, সে কথা তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। বাহিরে ক্রমশঃ কাল-বৈশাখীর ঝড় রুদ্ররূপে প্রকট হইয়া উঠিল। অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া সহসা প্রথম বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বজ্র ডাকিয়া উঠিল। সেই বিদ্যুতের

চকিত আলোকে, বজ্রের নির্ঘোষে শুনি, নিবেদিতা নিরুদ্ধশ্বাসে জপিতেছেন, কালী, কালী!

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন প্রাচী ও প্রতীচ্যের মধ্যে রাজনীতির মধ্য দিয়া একটা সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল, বিজয়ী প্রভুর অধিকার লইয়া প্রতীচ্য যখন প্রাচ্যের অন্তরকেও তাহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তুলিবার গোপন অয়োজন করিতেছিল, সেই সময় প্রাচ্যের দিক হইতে রাজনৈতিক অধীনতা সত্ত্বেও তাহার স্বধর্ম্মকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল পশ্চিম শুধু ভূমি অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, আপনার সভ্যতার বোঝাও প্রাচ্যের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে এবং কতকাংশ সার্থকও হয়। এই সময় বিভিন্ন দেশে কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা আপনাদের দিব্য-দৃষ্টির সহায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সর্ব্বগ্রাসী অভিযানের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন, এবং নিদ্রিত প্রাচীর অন্তরে এক আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও নব-জাগরণের উদাত্ত বাণী ধ্বনিয়া তোলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের বাণীর মধ্যে বিলুপ্ত-গৌরব প্রাচী তাহার শেষ আশ্রয়-দুর্গ খুঁজিয়া পাইল।

ভারতে পুরুষ-সিংহ বিবেকানন্দ এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভিনব বাণীকে আপনার অসামান্য জীবনসাধনা দ্বারা মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। সেই রাজনৈতিক গ্লানির মধ্যে শাশ্বত ভারতের এক অপূর্ব্ব ভাব-রূপ জাগিয়া উঠিল। বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকে লইয়া জগতের তীর্থ-পথে পরিভ্রমণে বাহির হন এবং বিজ্ঞান-বল-দৃপ্ত পাশ্চাত্য জগৎ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিবেকানন্দের দিকে চাহিয়া এক নূতন ভারতের পরিচয় পাইল, যে ভারতকে শক, হুন, মোগল, পাঠান, ওলন্দাজ, ইংরাজ কেহই পরাজিত করিতে পারে নাই। পরাধীন ভারতের ঊর্দ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চির-বিজয়ী শাশ্বত ভারত জাগিয়া উঠিল।

এই নব-ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব সাহিত্য গড়িয়া উঠে। প্রাচ্যের বিলুপ্ত গৌরবের কাহিনী, ভারতীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ভারতীয় আদর্শের প্রকৃত মর্ম্ম-উদ্ঘাটন, জীর্ণ কুসংস্কার ও পাশ্চাত্য বিকারের হাত হইতে চিন্ময়ী ভারতের অমৃত-বাণীর নব পাঠোদ্ধার—ইহাই হইল এই নব সাহিত্যের প্রধান বস্তু। নব অনুরাগের সমস্ত আবেগে এই সাহিত্য এমনি প্রদৃপ্ত হইয়া উঠে যে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে এবং আজ তাহার ধারা ভারতের সীমা ছাড়াইয়া বিশ্বের সাহিত্যে মূল প্রেরণা জোগাইতেছে। জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজী ও জাপানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা আজ সেই সুরে সুর মিলাইয়া বিশ্ব-ভারতীর মঙ্গল আরতির মন্ত্র রচনা করিতেছেন।

এই সাহিত্যের মূল প্রেরণা যাঁহারা জোগাইয়াছেন নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য-প্রতিভার সহিত অসামান্য জীবন-অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাহার প্রভাব ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া বহুদূর বিক্ষিপ্ত হয় এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়ার দরুণ পশ্চিমের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। সাবলীল ভাষায় হৃদয়ের অনুরাগের সহিত পূর্ণ সাধকের অভিজ্ঞতা লইয়া নিবেদিতা হিন্দু-ধর্ম্ম ও পুরাণের গূঢ়তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া সারা জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 'Kali worship', 'Kali the mother', 'Lambs among Wolves', 'Cradle tales of Hinduism,' 'The Web of Indian Life', 'An Indian study of Love and Death'—এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিলুপ্ত-স্মৃতি ভারতীয় আদর্শকে পুনরায় পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধরূপে তুলিয়া ধরিলেন। যে পাশ্চাত্য আদর্শ প্রচলিত কুসংস্কারের দোহাই দিয়া সুসভ্য করিয়া তুলিবার মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলিতে আসিতেছিল, এই

নব ভাবধারা ও সাহিত্যে সে গরল-প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হইল। ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুযুবক তাহার স্বধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইংরাজ-মহিলার মুখে শুনিয়া স্বধর্ম্মের উপর পুনরায় আস্থা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিল। পাশ্চাত্য জাতিরাও তাহাদেরই একজন স্বদেশবাসিনীর নিকট হইতে এই অনুরাগ-দৃপ্ত সাধনার মর্ম্মবাণী শুনিয়া আপনার অন্তরে আপনাদের নৈতিক পরাজয় মানিল।

"The Master as I saw him" এবং "Notes of some wanderings with Swami Vivekananda"—সাহিত্যের দিক দিয়া দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভারতের ইতিহাস-পুণ্য স্থানগুলি এবং তীর্থভূমিসমূহ নিবেদিতার চিত্তকে নিয়তই আহ্বান করিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরীতে নগরীতে পরিভ্রমণ করিয়া, সেই সমস্ত স্থানের পুণ্য ধূলির উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার ভাব-প্রবণ চিত্তে তিনি ভারত-ইতিহাসের শতধারার অনন্ত অবিরাম কল-নাদ শুনিতে পাইতেন। তাঁহার মানস-চক্ষে জগদ্ধাত্রীর চিন্ময়ীরূপে শাশ্বত ভারত বিকশিত হইয়া উঠিত, বহু সময় ধ্যানে "মা","মা", "আমার জননী ভারতবর্ষ" বলিয়া তিনি নাম জপিতেন। হিমগিরির চূড়া উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি অমরনাথ ও বদরি-কেদার তীর্থে গমন করেন এবং বহুস্থানে হিন্দু-সাধকের মত কুণ্ডাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। এই দুইখানি পুস্তকে নিবেদিতা এই সমস্ত ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরের কথা বলিতে গিয়া যে পরম দেবতার দীক্ষায় তিমি আত্মসমর্পিতা সেই গুরু বিবেকানন্দের চরিত্র ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকে দুইটী অমর চিত্তের যে অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—নিবেদিতার মধ্যে বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা—তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলে হয়। লেখকের অজ্ঞাতসারে কখন দুইটী চিত্র এক হইয়া গিয়াছে,

গুরু-শিষ্যের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শিষ্য গুরুর মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে, দুইটী চিত্ত কখন কোন্ অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় এক হইয়া গিয়াছে! এই অপূর্ব্ব আত্মবিলোপের নিগূঢ় কাহিনীর বিভিন্ন স্তর ও রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না—জানিতে পারিলে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা আরও মহিমান্বিত হইত।

নিবেদিতার চরিত্রে একটা অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিল এবং সেই সময়-কার দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন,তিনিই এই ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে ও প্রেরণায় তাঁহারা অন্তরের দিক দিয়া লাভবান্ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, স্যার জগদীশ, স্যার যদুনাথ, শ্রীযুক্ত বিপিন পাল, কুমার স্বামী, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি তদানীন্তন বাংলার ও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিরা সাক্ষাৎভাবে এই মহিয়সী নারীর প্রভাব অনুভব করেন।

স্যার যদুনাথ একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ, স্যার জগদীশ এবং স্বামী সদানন্দ সমভিব্যবহারে ভগিনী নিবেদিতা বুদ্ধ গয়ায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার আহ্বানে আমিও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করি। বোধি-বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আমরা বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তির সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতাম। নির্জ্জন ভগ্ন-মন্দিরে বজ্র-চিহ্নিত আসনে ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া নিবেদিতা বলিয়াছিলেন—"মানবতার কল্যাণের জন্য যিনি আত্মত্যাগ করেন তিনিই দেবতার হস্তে বজ্রের মত!" এই বজ্রের রূপক তাঁহার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যখন ভারতের জাতীয় পতাকা হইবে, তখন যেন তাহাতে এই বজ্রের চিহ্ন থাকে। স্যার জগদীশ পরে যখন তাঁহার বিখ্যাত বিজ্ঞানাগার নির্ম্মাণ করেন, তখন এই বজ্রের চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করেন।

একবার পাটনার বিখ্যাত খোদাবক্স লাইব্রেরীতে মোগল আমলের পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে নিবেদিতা সম্রাট্ শাহ্জাহানের স্বাক্ষর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'আমি কি উহা স্পর্শ করিতে পারি?' ঐটুকু স্পর্শের মধ্য দিয়া মনে হইল যেন তিনি সেই ঐশ্বর্য্যময় যুগে চলিয়া গিয়াছেন।"

নিবেদিতা মূর্ত্তিমতী প্রেরণার মত ভারতের নব আন্দোলনের নানা বিভাগে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন। ভারতীয় চিত্রকলার অভিনব অভ্যুদয়ের সহিত তাঁহার প্রেরণা বহুস্থলে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। স্কুলে মেয়েদের আল্পনা-দেওয়া এবং ছবি-আঁকার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। দেশ-সেবার পুরস্কার স্বরূপ কারাভোগ করিয়া যেদিন অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি পুনরায় কারামুক্ত হন, তখন তিনি তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "তপোবল" নাটক এই মহিয়সী নারীর নামেই উৎসর্গ করেন। কথা ছিল যে, নিবেদিতা দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহার অভিনয় দেখিবেন। কিন্তু তিনি আর হিম-গিরির শৃঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ১৩১৮ সালে হিমালয়ের ক্রোড়েই তিনি নশ্বর দেহ রক্ষা করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই অপূর্ব্ব নীরব জীবন-সাধনাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত মুহূর্ত্তে নিবেদিতা বলেন, "The boat is sinking, but I shall yet see the sun-rise"—"তরণী ডুবিয়া যায়, তবু মনে হয়, পরম-প্রভাত জাগিয়া উঠিবে—"

**নির্ব্বাপিত-জ্যোতি এই সমস্ত দীপ-শিখার আলো অপহরণ করিয়াই একদিন জগতে পরম-প্রভাত নিশ্চয়ই সমুদিত হইবে—আলোর অজস্র আশীর্ব্বাদে মর্ত্ত্য-পৃথিবী অমর হইয়া উঠিবে।**

# সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্‌

সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্‌ আপনার দেশে এবং বিদেশে যে যশ অর্জ্জন করেছেন, তাতে তাঁর নামের সার্থকতা উপলব্ধি হয়ে গেছে ; কারণ ল্যাগার্‌লফ্‌ মানে লরেল পাতা—বিজয়ীর জয়মাল্য।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিচিত্র সুর-লোকে সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফের একটা নিজস্ব সুর আছে। সে সুর, আমাদের বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ভুলে যেতে বসেছে এবং চারিদিকে যে রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও রীতি-নীতির অভিযান চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে সে সুরের হয়ত কোনও স্থান হবে না। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমার ঘুমপাড়ানির সুর, সেই সত্য ও মিথ্যায় জড়িয়ে মানব-মনের আদিম রহস্যের সুর। তার পেছনে কোনও বিজ্ঞান নেই, কোনও দর্শনশাস্ত্র নেই। সে সুরের প্রাণ সন্ধ্যার একটী তারায় কাঁপে—বড় মৃদু, বড় কোমল, অস্বাভাবিক। বিশ্ব-সাহিত্যে সে সুর শেষ শুনিয়ে যায়—নরওয়ের অপূর্ব্ব মায়াবী-শিশু হ্যান্‌স্‌ আণ্ডার্‌শন্‌। আণ্ডার্‌শন্‌কে যাঁরা শিশু-সাহিত্য ব'লে ফেলে রাখেন—তাঁরা বিশ্ব-সাহিত্যের কত বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন—তা তাঁরা জানেন না।

সেই যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের এই সুর-সভা-লোকে সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ীর প্রতীক্‌ সুইডেনের এই গিরি-কন্যা এক অপূর্ব্ব সহজ মেঠো সুরের সংযোগ করেছেন—যা আধুনিক অন্য কোনও সাহিত্যিকের মধ্যে নেই। গর্কীর তেজস্বিতা তাতে নেই বটে, রঁলার গভীরতাও নেই, ফ্রাঁসের তীক্ষ্ণধার মনীষাও নেই, আছে কিন্তু এক কোমল, শান্ত, নারী-হৃদয়ের পবিত্র পেলবতা—যা উচ্ছ্বাসে কোন কোন সময় অবৈজ্ঞানিক—বর্ণনায় কোন কোন সময় বস্তু-সম্বন্ধরহিত। সেল্‌মা

ল্যাগারলফ্‌ বৈজ্ঞানিক মানুষের কানে রূপকথা বলেছেন—রূপকথার ছন্দে—আমাদের প্রচলিত কোনও 'ism'-ই সেখানে স্থান পায় নি। সেল্‌মা ল্যাগারলফের সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই, বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে রূপকথার ছন্দ ও ভাবের একটা সুন্দর সমন্বয়।

সেল্‌মা যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় স্কাণ্ডেনেভিয়ার সাহিত্য বস্তুতন্ত্রের পরিপূর্ণ অধীন। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগের মধ্যে প্রাচীন যুগের সুর নিয়ে প্রাচীন সাগার মর্ম্মকথায় অন্তর পরিপূর্ণ করে সেল্‌মা জন্মগ্রহণ করেন।

সুইডেনের ভার্মল্যাণ্ড প্রদেশে Sunne নগরে মারবাকা ম্যানরেতে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ২০ নভেম্বর সেল্‌মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই-



বোনেরা অনেকগুলি ছিল, তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তাঁর পুরানাম Selma Ottalina Louisa Lagerlof.

সেল্‌মার বাবা ছিলেন,একজন সৈন্য-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্ম-চারী; বৃদ্ধ বয়সে জমি-জমা কিনে শান্তভাবে আপনার ছোটখাট জমি-দারীতে জীবন যাপন করছিলেন। ছেলেবেলায় সেল্‌মাকে অন্য সমস্ত ছেলে-মেয়েদের মত ছুটোছুটী করতে দেখা যেত না, আপনার খেল্‌না নিয়ে শিশু-সেল্‌মা গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে ছেলে-মেয়েদের খেলার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। শিশুকাল থেকেই মেয়েটীর লেখা-পাড়ার দিকে ভয়ানক ঝোঁক এবং যে বয়সে ছেলেমেয়েরা খেল্‌না নিয়েই ব্যস্ত সেই বয়স থেকেই সেল্‌মা বই নিয়ে পড়ত—আপন মনে একটা নিরালা ঘরের একটা কোণে বসে। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতে অতিথি এলে গল্প শোনবার জন্য তাকে ব্যস্ত করে তুলতো।

সুইডেনের গ্রামে গ্রামে, তার বাতাসে বাতাসে এখনও তার প্রাচীন দিনের সব বীরপুরুষের অপরূপ কাহিনী ঘুরে বেড়ায়, এখনও গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে মুখে কত প্রাচীন রূপকথা, বিচিত্র কাহিনী সগু-ঘটা ব্যাপারের মত নড়ে চড়ে বেড়ায়। বালিকা সেল্‌মা তন্ময় হয়ে সেই সব কাহিনী শুনতো আর তার শিশুর মন কল্পনার পুষ্পরথে চড়ে উধাও হত—জাতির রূপকথার স্বপ্নলোকে।

সেল্‌মার বাবার একটী লাইব্রেরী ছিল; কন্যাকে অবাধে সেই সমস্ত বই ঘাঁটবার অধিকার বৃদ্ধ দিয়েছিলেন। মেয়েটী কোন বই খুলে কিছু বুঝতো, কোনটী খুলে হয় ত কিছুই বুঝতো না, কিন্তু সেই লাইব্রেরীই ছিল তার খেলাঘর। সেল্‌মার বাবা-মা দুজনাই ছিলেন খুব উদার এবং উচ্চ শিক্ষিত, তাই মেয়েটির শিক্ষার দিক দিয়ে যাতে কোনও ত্রুটি না হয়—তাতে তাঁদের বিশেষ নজর ছিল।

নয় বছর বয়সের সময় Sunne থেকে সেল্‌মা সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলম্‌ শহরে শীত কাটাবার জন্য আসেন। সেখানে তাঁর কাকা থাক্‌তেন। এই Sunne থেকে Stockholm আসার স্মৃতি সেল্‌মা পরে এক গল্পে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রামের মুক্ত-জীবন থেকে একেবারে রাজধানীর পাষাণ-কারায়—বালিকা কিছুতেই আপনার মনকে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিল না। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"শহরের ছেলেমেয়েদের কেমন আলাদা আলাদা লাগতো—তারা কেমন চালাক, তাদের হাবভাব কেমন সোজা অথচ সহজ। আমি এদের দলে পড়ে একেবারে বোকা হয়ে গেলাম। তারা বলে পরিশুদ্ধ নগরের ভাষা—আমার কথা সেই ভার্মল্যাণ্ড-এর; কিন্তু সে যাই হোক্, এখানে কতকগুলি জিনিষ আশ্চর্য্যরকম সুন্দর পাওয়া গেল—এক র‍্যাক দেখি স্যর ওয়াল্টার স্কটের নভেল,—আর একটা জিনিষ, থিয়েটার।"

মাঝে মাঝে এক বুড়ী সেল্‌মাকে থিয়েটারে নিয়ে যেত। থিয়েটারের রঙ, আলো, পোষাক সমস্তই বালিকার মনে এক পরীর রাজ্য বলে মনে লাগত। শীত শেষ হয়ে গেলে ষ্টক্‌হলম্‌ থেকে Sunne-তে ফিরে গিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেল্‌মা নিজে এক থিয়েটারের দল গড়ে তুললো। বাড়ীর সকলের সামনে মহা ধূমধামে অভিনয় সমাধা হল। সেল্‌মা নিজে লিখছেন, "সেইদিন থেকে ইস্কুলে বসে অনর্থক আর অঙ্ক না ক'সে নাটক লিখতে সুরু করে দিলাম। পনের বছর বয়সে আমাদের বাড়ীতে যত কবিতার বই ছিল সমস্ত পড়া শেষ করে ফেলি এবং তখন থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করি।"

বিশ বছর বয়সে সেল্‌মা—আবার ষ্টক্‌হলম্‌-এ আসেন। এবার বেড়াবার জন্য নয়—Teacher's College-এ প্রবেশাধিকার অর্জ্জনের জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে। পঁচিশজনকে নেওয়া হবে

—মোট পরীক্ষার্থী ছাত্রীর সংখ্যা চল্লিশ। এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে সেল্‌মা উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ সালে Teacher's College-এ প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিন বছর তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়। এখানকার পড়া শেষ হলে সেল্‌মা Skane প্রদেশে এক বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজের অবসরে অবসরে মর্ন সাহিত্যের রূপমহলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত; কিন্তু এ সময় তিনি বিশেষ কিছুই লিখেন নি। মাঝে মাঝে কাগজে কবিতা পাঠাতেন এবং ক্লাশের ছুটির পর মেয়েদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপূর্ব্ব রহস্যময় সব গল্প বলে যেতেন।

তারপর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—The Story of Gosta Berling তাঁর মনে জমা হয়ে উঠতে থাকে।

প্রথম যৌবনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ও সাধনার বিবরণ সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্ স্বয়ংই দিয়েছেন। Gosta Berling-এর কাহিনীর জন্ম-কথা নিয়ে তিনি "The Girl from the Marsh Croft" নামক গল্পের বইতে "The story of a story" নাম দিয়ে একটী গল্প রচনা করেছেন। সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফের জীবনের সঙ্গে এই গল্পটীর বিশেষ যোগ আছে—কেন না এই গল্পটাই হচ্ছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। তাহারপর হইতে তিনি, Jerusalem, Marbaka, Outcast প্রভৃতি বহুপুস্তক রচনা করেন।

১৯০৭ সালে সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ University of Upsala হইতে Doctor of Literature উপাধি পান। তাহার দুই বছর পরে তিনি সাহিত্যের জন্য Nobel Prize পান। ১৯১৪ সালে তিনি Nobel Prize নির্ব্বাচন-সভার জগৎ-বিখ্যাত আঠারো জন সভ্যের মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হন। নারীর পক্ষে এই সম্মান সর্ব্বপ্রথম।

# পণ্ডিতানী রমাবাঈ

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম অভিযানের যুগে ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে যে কয়েকজন মহাপ্রাণ নর-নারী জীবন উৎসর্গ করেন, পণ্ডিতানী রমাবাই তাঁহাদের অন্যতম।

'আজ আমাদের সামাজিক জীবনের যে-সমস্ত সমস্যা সমাধান না করিয়া আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না—অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে রমাবাঈ সারা ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্য দ্বারা সেই সমস্ত সমস্যার দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন।



১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বের নিকটবর্ত্তী

পশ্চিমঘাটের অনতিদূরে গঙ্গামল জঙ্গলে এক দরিদ্র পরিবারে রমাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত মিশ্র।

বাল্যে রমাবাঈ তেমন কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা একজন বিদুষী রমণী ছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায় তিনি যখন ভাগবত পড়িতেন, বালিকা তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। মাতা আদর করিয়া কন্যাকে সেই সমস্ত শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং বিস্ময়ের কথা, অপূর্ব্ব স্মরণ-শক্তির ফলে বালিকা ক্রমশঃ তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারিত। কথিত আছে যে, বালিকা-বয়সেই এইভাবে রমাবাঈ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত কণ্ঠস্থ করেন।

সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী অনন্ত মিশ্র অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দেন এবং তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা এই কন্যার বিবাহের জন্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। একেবারে নিঃস্ব হইয়া অনন্ত মিশ্র তাঁহার স্ত্রী, কনিষ্ঠা কন্যা রমাবাঈকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হন। বালিকা-জীবনে এই ঘটনা রমাবাঈএর চিত্তে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি পরবর্ত্তী জীবনে বাল্য-বিবাহ, পণ-প্রথা প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার কঠোরতা দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

রমাবাঈ যখন পিতার সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর ছিল। তীর্থের পথে পথে, তিনি গভীর ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ষোলো বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীনা হইয়া রমাবাঈ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং গভীর ভাবে অধ্যয়নের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন। তিনি একে একে হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পুরাকালের তাপস-রমণীদের মত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠেন।

ভারতে নারী-শিক্ষার অবনতি দূর করিবার কঠোর ব্রত লইয়া তিনি যৌবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও নবদ্বীপের সেই সময়কার বহুগণ্যমান্য পণ্ডিতগণের সহিত রমাবাঈ বহু শাস্ত্রীয় আলোচনা করেন। এই নারীর অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করেন।

রমাবাঈএর সমস্ত প্রচারের মূল কথা ছিল যে, প্রত্যেক হিন্দুকুমারীকে বিবাহের পূর্ব্বে সংস্কৃত অথবা জাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিতা করিয়া পরে বিবাহ দিওয়া উচিত। কলিকাতায় আসিয়া রমাবাঈ সংস্কৃত কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে নারী-শিক্ষা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতা হইতে রমবাঈ এলাহাবাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর ভারতে নারী-শিক্ষার একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। কিন্তু এই সময় সহসা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় সম্পূর্ণ আশ্রয়হীনা হইয়া রমাবাঈ এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র বিপিনবিহারী মেধাবীকে বিবাহ করেন। বৎসরাধিক কাল যাইতে না যাইতে তিনি বিধবা হইলেন।

ঐহিকের সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিতা হইয়া রমাবাঈ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধ্যে নিজকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহিলেন এবং এলাহাবাদে বহুদিনের চেষ্টার ফলে আর্য্য-মহিলা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সমাজের উদ্দেশ্য বাল্য-বিবাহ রহিত এবং নারী-শিক্ষা বিস্তার করা

সংস্কৃত-সাহিত্যে ও শাস্ত্রে অসীম পণ্ডিত হইয়া, তাঁহার বাসনা হইল, তাহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার যোগসাধন করিতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। তখন ইংলণ্ডেও সবে মাত্র নারীর উচ্চশিক্ষার জন্য

তুমুল আন্দোলনের পর নানাস্থানে নারী-শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। সেই সমস্ত কলেজের মধ্যে চেথেলহাম কলেজই ছিল সর্ব্ব-প্রধান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রমাবাঈ চেথালহাম কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তিনি জগতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়া ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দেন। আজ আমেরিকায় ভারতের বাণী বহু ভারতীয়ের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছে —সেদিন একজন ভারত-রমণীর কণ্ঠে সেই সুদূর বিদেশে ভারতের জয়গান বোধহয় প্রথম ধ্বনিয়া উঠে।

# পরিশিষ্ট

মাত্র চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। বাঙ্গালাদেশে নয়—একেবারে ইংলণ্ডে, ল্যাঙ্কাশায়ারের একটী বৃহৎ নগরে। একদিন রাত্রিবেলায় পথে লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, পথে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বিস্ময়ে বাড়ীতে আসিয়া জানাইল, বাড়ীতে যাহারা শুনিল তাহারা অবাক্ হইয়া গেল এবং ঘৃণায় নাসিকা-কুঞ্চন করিল, এমনিভাবে সারা শহরে বিস্ময়, ঘৃণা ও লজ্জার মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে, নগরের যে রাস্তা সমুদ্রের দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তায় একজন পরিচিত ডাক্তারের স্ত্রীকে 'বাইসাইকেলে' চড়িয়া যাইতে লোকে দেখিয়াছে! নারীসুলভ লজ্জার এই ব্যভিচারের জন্য ডাক্তার-পরিবারকে সেদিন অনেক সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় এবং তাঁহাদের একরকম একঘরে করা হয়। মাত্র চল্লিশ বছর আগে ইংলণ্ডে এই ঘটনা ঘটে। যে রাস্তা দিয়া সেদিন ডাক্তারের স্ত্রী 'বাইসাইকেল' চড়ার অপরাধে সামাজিক দণ্ডভোগ করিয়াছিল, পাঁচবছর পরে সেই রাস্তায় নারী-সাইকেল-চালকদের ভিড়ে পদাতিক পথিকের পথ-চলা দুরূহ হইয়া উঠে। সেদিন যে-সমস্ত ব্যক্তি নারীকে বাইসাইকেলে চড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কন্যা-বধূরা আজ হকি ফুটবল খেলিতেছে, এরোপ্লানে একা দূরপথে যাত্রা করিতেছে, পুরুষের সমস্ত খেলায় ও সম্মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে এবং পুরুষের খেলায় পুরুষকেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া চলিয়াছে।

ব্যবহারিক জীবনে মাত্র এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নারীর এই পরিবর্ত্তনের অন্তরালে আর একটা বৃহৎ নৈতিক পরিবর্ত্তন সংশোধিত হইয়া

গিয়াছে। পুরাতন বিচার এবং বিধানের বিরুদ্ধে এক নূতন বিচার ও বিধান জাগিয়া উঠিতেছে—এই সমস্ত হইল তাহারই বাহিরের পরিবর্ত্তনশীল অভিব্যক্তি। নারীর মূল্য ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া পুরুষ যে নিরিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাখিয়াছিল, তাহার অপব্যবহার অথবা সুব্যবহারের একমাত্র অধিকার তাঁহারাই উপভোগ করিত; বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আলোকে নারী আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ব্যবস্থার যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। এই বিদ্রোহ স্বভাবতঃ প্রতিক্রিয়ামূলক উন্মাদনার বশে নানাদেশে নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং অনেক স্থলে নারীর এই নব-জাগ্রত স্বাতন্ত্র্য-বোধ পুরুষত্বের অনুকরণে অপচয়িত হইতেছে; কিন্তু যে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান নারী-আন্দোলনের ভাব-তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস সত্যই নারী-শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে উজ্জ্বল।

নারীর ভোটাধিকার লইয়াই বর্ত্তমান নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সর্ব্বদেশে সূত্রপাত হয়। নারীর এই ভোটের দাবী ও পুরুষের ভোটের দাবী—উভয়ই এক জিনিষ হইলেও, উহাদের পশ্চাতে দুইটী স্বতন্ত্র প্রেরণা আছে। কোনও পুরুষকে যখন ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহার পুরুষত্বে কোথাও আঘাত লাগে না, কোনও ব্যবহারিক অথবা স্বাভাবিক যোগ্যতা সে অর্জ্জন করে নাই—তাহাতে ইহাই বুঝায়। কিন্তু নারীর পক্ষে উহা স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করে। যতই যোগ্যতা থাকুক্ না কেন, নারী বলিয়াই সে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত। সেই কারণে এই ভোটের দাবীকে অস্বীকার করা আর তাহার নারীত্বকে অস্বীকার করা তাহার নিকট এক হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষের ন্যায় ভোটের অধিকার দাবী করিয়া বিভিন্ন দেশে যে নারী-আন্দোলন সূত্রপাত হয়, তাহাতে রাজ-

নৈতিক আন্দোলনের সমস্ত অভিব্যক্তি থাকিলেও তাহা মুলতঃ পুরুষের নিকট হইতে নারীত্বের একটা নাগরিক মর্য্যাদা আদায় করিবার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। ভোট পুরুষের নিকট রাজনৈতিক ব্যবসার একটা বড় রকমের পণ্য হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নারীর নিকট উহা তাহার আত্মমর্য্যাদার প্রতীক্। সেই জন্যই নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নারীর ভোট্বাধিকার-আন্দোলনের সঙ্গেই বিজড়িত।

নারীর উচ্চতর শিক্ষার কথা ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম **মেরী অষ্টেল** (১৬৬৮—১৭৩১) উপলব্ধি করেন এবং স্বজাতির উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তিনি যথেষ্ট লেখালেখি করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আবেদন করিয়া মেরী আষ্টেল "Serious Proposals to Ladies" নামক পুস্তক রচনা করেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রথম কলেজস্থাপনের প্রায় দুশো বৎসর পূর্ব্বে মেরী অষ্টেল নারীদের কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন, কিন্তু লোকে তখন অষ্টেলের কথায় মধ্যযুগের মঠের কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করে নাই।

সেই সময় ইংলণ্ডে "রবিন্‌সন্ ক্রুসোর" বিখ্যাত লেখক **ড্যানিয়েল দিফো** (১৬৫৯—১৭৩১) নিতান্তই সঙ্কোচের সঙ্গে লিখিলেন, "আমরা প্রতিদিন নারীকে তাহার দুর্ব্বলতার জন্য হেয় মনে করি বটে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমারা যে রকম শিক্ষার সুবিধা পাই, সে রকম সুবিধা ও শিক্ষা তাহারা যদি পায়, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গিনীদের হেয় মনে করিবার হেতু চলিয়া যাইবে।" ইংরাজী-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার **এডিসন** (১৬৭২—১৭১৯) এবং **ষ্টীল** (১৬৭২—১৭১৯) তাঁহাদের বিখ্যাত পত্রিকা "স্পেক্টেটারে" তখন আভিজাত্য নারীদের বিলাসিতা ও অন্তঃসার-শূন্যতার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করেন।

এডিসন ও ষ্টীলের লেখার অপূর্ব্ব ভঙ্গীর মধ্যে কিন্তু নারীশিক্ষার আদর্শের কথা চাপা পড়িয়া যায়। ইংলণ্ডের লোকেরা যতখানি তাঁহাদের লেখার ধরণের প্রশংসা করিল,—তাঁহাদের বক্তব্য সম্বন্ধে ততখানি ঔদাসিন্য দেখাইল।

কিন্তু এই লেখার ফলে আভিজাত্য নারীমহলে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। শুধু "ফ্যাসানেবল" হইবার অপবাদ হইতে নিজেদের আত্মরক্ষা করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা উচ্চতর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। ইঁহারাই "Blue-stocking" নামে ইতিহাসে খ্যাত। এই প্রতিষ্ঠানে দেশের আভিজাত্য শ্রেণীর সকল নারী যোগদান করিলেন। সারাক্ষণ ঐশ্বর্য্যের নিত্য নব বিজ্ঞাপন সারা অঙ্গে বহিয়া, তাস খেলিয়া, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিয়া অফুরন্ত অবসরকে অপব্যয় করা অপেক্ষা এই **ব্লু-ষ্টকিং**এর দল একটা নূতনতর জীবন যাপনের ধারা আনিলেন। **মিসেস্ এলিজাবেথ মণ্টেগু** (১৭২০—১৮০০) এই দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনকে নারী-শিক্ষা বা নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন অপেক্ষা আভিজাত্য শ্রেণীর নারীদের জীবন-যাত্রা সমস্যার সমাধান চেষ্টা বলিলেই ঠিক হয়।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাকাল এক বৃহৎ পরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছিলেন। এতদিন ধরিয়া যে মূল্য, যে মর্য্যাদা, যে বিচার-পদ্ধতি দ্বারা মানুষ তাহার সকল গতিবিধি ও কর্ত্তব্যের ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাহা সহসা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ফরাসী-বিপ্লব ও কল কারখানার প্রসার এই অতি পুরাতন প্রাচীন পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নূতন জগতের সৃষ্টি-স্বপ্নকে সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। মানুষের নূতন রকম

মূল্য ও মর্য্যাদা ধার্য্য হইল ; বিজ্ঞান আসিয়া সকল বস্তু তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া লইতে লাগিল ; কলকব্জা আসিয়া নূতনতর অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি দ্বারা ভৌগলিক সীমানা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যেক স্থানীয় সমস্যাকে বৃহত্তর জগতের চেতনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিল। যে সমস্যা ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে হয়ত নগণ্য ছিল, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া বিজ্ঞান তাহাকে বিশ্বব্যাপক করিয়া তুলিল।

ফরাসী-বিপ্লব আসিয়া ফ্রান্সের শাসন-তন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপে এক নূতন ভাবতন্ত্রের সৃষ্টি কবিল। ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং শ্রমিক-আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে Industrial Revolution বলে, এই তিনটী ঘটনা মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধের এক নূতন সংজ্ঞা আনিয়া দিল। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সঙ্ঘ, প্রত্যেক গোষ্ঠী, প্রত্যেক মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক জাতির সাহিত্য এই নব স্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বাধীনতার বাণীতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনও এক স্পষ্ট ও ব্যাপক ভাব-রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

যে ফরাসী-বিপ্লব ভাব-জগতে এই পরিবর্ত্তন আনিল, তাহাতে নারীরও প্রধান অংশ থাকায়, নারী-আন্দোলনও এই ধারায় সাক্ষাৎ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসের সহিত দুইটী রমণীর ভাগ্য একান্তভাবে বিজড়িত এবং সকল দোষ-ত্রুটীর বাহিরে এই দুইটী হতভাগ্য রমণীর ঘটনাপূর্ণ জীবন নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ও মর্য্যাদার কথা সকলের নিকট তুলিয়া ধরিল। একজন ফ্রান্সের হতভাগ্য সম্রাজ্ঞী **ম্যারী আঁতোইনেতে** (Marie Antoinette) এবং আর একজন উন্মাদিনী দেশপ্রেমিকা **সার্লতে কর্দে** (Charlotte Corday ).

ফরাসী-বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বিখ্যাত নারী-স্বাধীনতার প্রচারক **ম্যারী ওলষ্টোনক্রাফ্ট** সর্ব্বপ্রথম নারীর পরাধীন ও অবজ্ঞেয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রদৃপ্ত ভাষায় বৈজ্ঞানিক মতবাদের সহায় লইয়া লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার "Vindication of the Rights of Woman" নামক বিখ্যাত পুস্তকে তিনি নারীর স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন। জীবনের নানাক্ষেত্রে নারীরও অধিকার আছে, তাহার শক্তি দিয়া, সামর্থ্য দিয়া, জগতের অগ্রগতিকে সহায়তা করার। এতদিন ধরিয়া পুরুষ নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও অলস সুবিধাবাদিতার দ্বারা নারীর এই শক্তির বিকাশকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে এবং যখনই নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে তখনই তাহাদের দুর্ব্বলতা, পঙ্গুতার দোহাই দিয়া তাহাদের আরও পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা নারী পুরুষের সমকক্ষ শক্তি-অর্জ্জনে নানাক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রগতির সহায় করিয়া পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী হইবার অধিকার রাখে। এই অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষের শুধু সুখ-বিলাসিতার সামগ্রীরূপে নারীকে জগতের বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র দূরে রাখিয়া পুরুষ যেমন একদিকে নারীত্বকে জড়ত্ব বিবেচনায় অপমান করিয়াছে, অন্যদিকে এত বড় শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া সভ্যতার ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রী-মণ্ডলী মেরী ওলষ্টোনক্রাফটের এই আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। সাক্ষাৎভাবে সেইজন্য নারীর উচ্চশিক্ষার আন্দোলনে তাঁহার কোনও বিশেষ দান না থাকিলেও, তিনি যে নূতন চিন্তাধারা আনিয়া দিলেন, তাহাই অদূর ভবিষ্যতে কর্ম্মরূপ গ্রহণ করিয়া উঠে।

কিন্তু আর একটী ঘটনা তখন সবার অজ্ঞাতে য়ুরোপের সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনধারা বদলাইয়া চলিয়াছিল এবং সে পরিবর্ত্তনকে

বাহির হইতে কেহই বাধা দিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরে বৃহৎ সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। যন্ত্র আসিয়া ধীরে ধীরে প্রাচীন পদ্ধতি সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিল। বর্ত্তমান জগতের যে সমস্ত সমস্যা আজ জগৎ জুড়িয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, সেদিন সেই যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নারী-আন্দোলনের মূলেও এই যন্ত্র-সভ্যতা প্রধানভাবে রহিয়াছে। এতদিন ধরিয়া মানুষ কুটীর-শিল্পের দ্বারা তাহার নিত্য প্রয়োজনের জিনিষের অভাব দূর করিত। কিন্তু বিজ্ঞান আসিয়া যখন একদেশকে আর এক দেশের অতি নিকটে আনিয়া দিল, তখন মানুষ বৃহৎভাবে পণ্য সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। ফলে কারখানার সৃষ্টি হইল। কারখানা আসিয়া কুটীর-শিল্পকে ধ্বংস করিল—যন্ত্রের কান্তিহীন দানবীয় শক্তির সহিত মানবের রক্তমাংসের কোমল ক্ষুদ্র হস্ত পাল্লা দিতে পারিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুটির-শিল্প ছিল, প্রাঙ্গণের অন্তরালে নারীদেরই তত্ত্বাবধানে। নারীরা সাক্ষাৎভাবে আপনাদের শ্রম দিয়া এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এবং পরিবারের অর্থ-সঙ্গতির দিক দিয়া সমাজ এইভাবে নারীর সহায়তা পাইত। কিন্তু কুটীর-শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় নারীদের এই অর্থকরী শক্তি পঙ্গু হইয়া গেল এবং তাহার ফলে সমাজের নিম্নস্তরে নিদারুণ অর্থ-নৈতিক দুর্গতি দেখা দিল। এই অর্থ-নৈতিক চাপের ফলে সমাজের নিম্নস্তরের নারীরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাধ্য হইয়া কারখানার কাজে যোগদান করিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা অন্য কোনও সামাজিক মর্য্যাদা-সঙ্গত কাজ না পাইয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজের দিকে ঝোঁক দিতে বাধ্য হইল। যে-নারী এতদিন ধরিয়া কর্ম্মমুখর জীবনের যবনিকার অন্তরালে আপনার নিঃশব্দ অস্তিত্বের ধারা

বহিয়া চলিয়াছিল, সহসা সে আপনার প্রাণ-ধারণের জন্য পুরুষের সহিত একসঙ্গে প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিল যে, একই কর্ম্মক্ষেত্রে একই অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক আবরণের মধ্যে তাহাতে ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের মধ্যে একটা বহুদিন-নির্দ্দিষ্ট ভেদ-রেখা কে টানিয়া রাখিয়াছে। অন্তঃপুরের মধ্যে নারী সে ভেদরেখার বিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, অথবা উপলব্ধি করিলেও তাহা তাহার মানসিক স্থৈর্য্যে কোনও চঞ্চলতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিন্তু একই অর্থ নৈতিক অথবা সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া যখন নারী ও পুরুষ প্রকাশ্য জগতের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একসঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল, তখন নারী স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল যে, য়ে-সামাজিক নিয়ম আজ তাহাকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহাই তাহার বাহিরের কর্ম্ম-প্রাতষ্ঠার সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

তাই যুগব্যাপী সেই অর্থ-নৈতিক সমস্যার চাপে এবং অন্যান্য ভাব-প্রবাহের ফলে নারী যখন বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল, তখন স্বভাবতই পুরুষের গড়া চারিদিকের বাধার বিরুদ্ধে তাহাকে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতে হইল।

কিন্তু নারীর বিশেষ অধিকারের প্রয়োজনীয়তার কথায় বহুদিন ধরিয়া সমাজবিশেষ কর্ণপাত করে নাই। যে সমস্ত ভদ্রমহিলা শিক্ষা ব্যাপারের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, শিক্ষা দিবার অধিকার বা দাবী তাঁহারা বিশেষ কিছুই অর্জ্জন করেন নাই। যে নিজে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত নয়, সে অপরকে শিক্ষা দিবে কি করিয়া? মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য মেরী আষ্টেল ও ওলষ্টোনক্রাফট যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃ সেই সমস্ত অবজ্ঞাত পুস্তকের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই সমস্ত অর্দ্ধ-শিক্ষিত শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম Governesses' Benevolent Institution স্থাপিত হয়। এই সময় ( ১৮৪৮ ) বিখ্যাত নারী-শিক্ষা-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক Frederick Denision Maurice ( ১৮৪৮—১৮৭২ ) ইংলণ্ডের প্রথম মহিলা কলেজ Queen's College প্রতিষ্ঠিত করেন। Denision Maurice-এর প্রচেষ্টার ফলে এই কলেজ হইতে ইংলণ্ডে নারী-শিক্ষার এক প্রবল আন্দোলন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। অচিবকাল মধ্যেই Queen's College এর অনুকরণে ইংলণ্ডের বিখ্যাত নারীশিক্ষার কেন্দ্রসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে। কুইন্‌স্ কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম যে দুইটী মেয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়া নারী-শিক্ষা আন্দোলনের সহায়তা করেন, তাঁহাদের নাম **ডরথিয়া বিল** (১৮৩১—১৯০৬) এবং **ফ্রান্সেস্ মেরী বাস** (১৮২৭—৯৪)। ডরথিয়া বিল চেলটেন্‌হামের লেডিজ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন এবং ফ্রান্সেস্ মেরী বাস নর্থ লণ্ডন কলিজিয়েট স্কুলের প্রথম প্রধান-শিক্ষক হন। কয়েক বৎসরের মধ্যে Queen's College এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে পুরুষের সমকক্ষ শিক্ষার অধিকার দিবার জন্যই ইংলণ্ডের বিখ্যাত নারী-শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিল—অক্সফোর্ডে সোমারভাইল কলেজ এবং লেডী মারগারেট হল, ক্যাম্ব্রিজে প্রতিষ্ঠিত হইল গার্টন এবং নিউনহাম কলেজ। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশেও ধীরে ধীরে পুরুষের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পার্শ্বে নারীরও শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

নারীর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী নূতন সমস্যা দেখা দিল। উচ্চশিক্ষার অধিকার লইয়া এতদিন ধরিয়া পুরুষ যে সমস্ত পদ মর্য্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, স্বভাবতই সে সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত নারীর দাবী একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিল। যে শিক্ষা পাইয়া

পুরুষ ডাক্তার হইতে পারে, উকীল হইতে পারে, সে শিক্ষা পাইয়া নারী কেন সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? শিক্ষা ও ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নারী ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে সমমর্য্যাদায় আপনার আসন করিয়া লইতে লাগিল; কিন্তু তিনটী ব্যাপারে নারী পুরুষের সমমর্য্যাদার অধিকার অর্জ্জন করিতে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং এই বাধার ফলে নারী-স্বাধীনতার অন্দোলন তীব্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ নারী-স্বাধীনতার সংগ্রাম-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। একদিকে যেমন একদল রজেনৈতিক পুরুষ এই স্বাধিকারবাদকে নানা কারণে বাধা দিতে থাকেন, আর একদিকে যুগস্রষ্টা সাহিত্যিকগণ নারীর এই নব জাগ্রত চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তির বাণীকে সাহিত্যে অভিনব রূপ প্রদান করিতে লাগিলেন।

যে তিনটী বিশেষ অধিকার লইয়া নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রামে পরিণত হয়—তাহা হইতেছে, (১) ডাক্তারী (২) আইন-ব্যবসায় (৩) ভোটাধিকার। প্রথম দুইটীর মীমাংসা সামান্য সংঘর্ষের ফলেই সাধিত হয়, কিন্তু তৃতীয় অধিকার লইয়া সত্য সত্যই নারী স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

শুশ্রূষার ব্যাপারে নারীর একটা স্বাভাবিক অধিকার গৃহের চতুঃ-সীমানার মধ্যে পুরুষ বহুকাল হইতে বিনা বাধায় নারীকে ভোগ করিতে দিয়া আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সাধারণের প্রয়োজনের জন্য নারীর সেবা-ধর্ম্মকে কাজে লাগাইবার সার্থকতা পুরুষ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকরা যখন সেবার অভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতেছিল, সেই সময় মহিয়সী নারী **ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল** সামাজিক কুণ্ঠাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া

নারীর এক নূতন সার্থকতার স্বরূপ জগতের সকলের নিকট তুলিয়া ধরিলেন। সে কাহিনী পুস্তকের অন্যত্র কথিত হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রভাবের ফলে ইংলণ্ডে এবং নানাদেশে "নার্সের" উপযুক্ত প্রাথমিক ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু তখনও নারীর জন্য সম্পূর্ণ ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সমাজ উপলব্ধি করে নাই। অধিকন্তু সে বিষয়ে একটা সামাজিক নিষেধের বাধাই পরিস্ফুট ছিল কিন্তু ইহা একান্ত স্বাভাবিক যে, মানব-চিত্ত, তাহা পুরুষের অথবা নারীরই হউক্ —খণ্ড বিদ্যার অতৃপ্তি সহ্য করিতে পারে না। ইংলণ্ডে প্রথম নারী যিনি এই ব্যাপারে নারীর অধিকার স্বীয় জীবন-সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার নাম **এলিজাবেথ গ্যারেট এণ্ডারসন** (১৮৩৬—১৯১৭) চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রাথমিক শুশ্রূষা-বিদ্যা শিক্ষা করার পর এলিজাবেথের বাসনা হইল যে, তিনি পুরুষের ন্যায় সম্পূর্ণ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু এই বাসনা লইয়া তিনি যেখানেই উপস্থিত হইলেন, সেইখানেই বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। কোনও চিকিৎসা বিদ্যালয় তাঁহাকে ভর্ত্তি করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে নার্সের কাজ করিতে করিতে পুস্তকাদির সাহায্যে আপনিই চিকিৎসা-বিদ্যা গৃহে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, এলিজাবেথ "প্র্যাক্টিস্" করিবার অধিকার লাভের জন্য পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কোনও পরীক্ষা-মণ্ডল তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার সুবিধা দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Society of Apothecaries এর নিকট তিনি আবেদন করিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী অনুযায়ী যে কোনও ছাত্র কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, তাহাকে 'লাইসেন্স' দেওয়া হইত, কোনও নারী যে

কোনও দিন সেই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাইসেন্সের অধিকারী হইতে পাবে, তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের আইন-কর্ত্তারা ভাবিতে পারেন নাই। এলিজাবেথ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং যথারীতি ডাক্তারী করিবার 'লাইসেন্স'ও পাইলেন। কিন্তু সেই ঘটনার পর হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোনও নারী লাইসেন্সের অধিকাবী না হইতে পারে, তাহাব জন্য নিয়মকানুন পরিবর্ত্তন করিল।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পাইয়া এলিজাবেথ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্ট মেরী ডিস্পেন্সারীতে একটা চাকরী পাইলেন। ইহার চার বৎসর পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য ফ্রান্সে আসিলেন এবং সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-ডি উপাধি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ইংলণ্ডের চারিদিকে ডাক্তারী বিদ্যায় নারীর অধিকার লইয়া আন্দোলনের ফলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নারীদের শিক্ষার জন্য London School of Medicine প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশেষে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ পার্লামেন্টের একটী "এ্যাক্টে" ডাক্তারী বিদ্যায় নারীর উপাধি লাভের অধিকার দেওয়া হইল।

মিস্ এণ্ডারসন আপনার সাধনার দ্বারা সমগ্র নারীর হইয়া এই অধিকার অর্জ্জন করেন এবং তাঁহারই জীবনে দেখাইয়া দেন যে, যে-কৃতিত্ব পুরুষ ডাক্তারী বিদ্যায় অর্জ্জন করিয়াছে নারীও সেই কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে। ডাক্তার হিসাবে মিস্ এণ্ডারসন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং তাহার ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আল্ডবার্গের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে বৃটীশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে নারী মেয়র হওয়ারও এই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডে যখন ডাক্তারী বিদ্যায় উপাধি-লাভের জন্য মিস এণ্ডারসন জীবনপাত করিতেছিলেন, অন্যান্য দেশেও

কয়েকজন নারী এই অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমেরিকার Geneva Medical College হইতে **মিস্ এলিজাবেথ ব্লাকওয়েল** ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী পাশ করেন। বর্ত্তমান জগতে ইনিই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম উপাধি-প্রাপ্ত নারী ডাক্তার

কিন্তু নারী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের আসলরূপ ফুটিয়া উঠে নারীর ভোটাধিকার লইয়া। ইংলণ্ডে নারী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের একটী বিজ্ঞাপনে। এই বিজ্ঞাপনে জনসাধারণকে নারীর ভোটাধিকার অর্জ্জন করিবার সহায়তা করিতে অনুরোধ করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম শেফিল্ড নগরে ভোটাধিকার-অর্জ্জন আন্দোলনের জন্য একটী নারী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম হয় Sheffield Female Political Association. **অ্যানি কেট** নামক একজন নারীর উদ্যমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া উঠে। এই বিষয়ে প্রচার কার্য্যের জন্য এবং নারী-স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শুধু নারী-সমস্যার আলোচনা লইয়া "English Woman's Journal" নামক পত্রিকা বাহির হইল। এই পত্রিকায় আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের সম্মুখে ধীরে ধীরে নারীর আর এক অভিনব অস্তিত্ব ও দাবীর কথা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পুরুষ ও নারীর যে ভেদ এত-দিন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সাংসারিক জীবনের একতরফা মীমাংসার আড়ালে অস্ফুট হইয়া ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ্য রাজপথে সহসা তাহা নারীর ভোটাধিকার সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া অতীব তীব্র ও অপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। নারীর এই অভিনব আত্মবিকাশকে পুরুষ প্রথমে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের মধ্যে দিয়াই গ্রহণ করে এবং স্নায়ুর

উত্তেজনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। তাহার ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক ধীরে ধীরে সাহিত্য, সমাজ, গৃহ সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ইংরাজ-রাজনৈতিকগণ এই নারী-আন্দোলনকে একটা "গেরস্থালী" ঝগড়ার মত দেখিতে লাগিলেন এবং কেহই ইহাকে কোনও গুরুত্ব দিল না। পুরুষের এই অবস্থায় "সাফ্রেজিষ্ট" নারীরা আরও বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডের নানা স্থানে ধীরে ধীরে বহু নারী-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে নিয়মিত ভাবে প্রচার কার্য্য চলিতে লাগিল এবং সাফ্রেজিষ্ট নারীগণ প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া নারী-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সভায় তাঁহারা জনতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে লাগিলেন।

এই সময় ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক **জন ষ্টুয়ার্ট মিল** নারী-স্বাধীনতার এই আন্দোলনের সার্থকতা উপলব্ধি করেন এবং তিনি এই নব-জাগরণে আপনার অপূর্ব্ব লেখনী ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ইন্ধন প্রদান করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তিকা "Subjection of Women" প্রকাশিত করেন এবং নারী-স্বাধীনতার সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও অপরিস্ফুট বাসনাকে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। এতদিন যে আন্দোলন পুরুষের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের উপলক্ষ্য হইয়াছিল, মিলের সহযোগিতায় সেই পুরুষের নিকট তাহা ক্রমশঃ এক ভয়াবহ সত্য হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনে দুইটী নারীর নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদেরই অক্লান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে সমগ্র বিশ্বে

আজ নারী-স্বাতন্ত্র্যের দাবী আর উদাসীন রাষ্ট্রের উপেক্ষার বস্তু নয়। একজনের নাম **মিসেস্ হেনরী ফসেট,** অপরজনের নাম **মিসেস্ প্যাঙ্কার্হার্ষ্ট।** মিসেস্ ফসেট নারী-স্বাতন্ত্র্য-আন্দোলনের বাণী ও ভাব-প্রেরণা জোগাইয়াছেন, মিসেস্ প্যাঙ্কার্হার্ষ্ট তাহাকে কর্ম্মে ও সংগ্রামে জয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এই দুই অগ্র-নায়িকা ব্যতীত অন্যান্য যে-সমস্ত নারী বহুবিধ লাঞ্ছনা ও কারাবাসের মধ্য দিয়া এই আন্দোলনকে সফল করিয়া তোলেন, তাঁহাদের মধ্যে **মিসেস্ ডেস্‌পার, কুমারী ডেভিস্** এবং **মিসেস্ প্যাঙ্কার্হার্ষ্টের** কন্যা-**কুমারী প্যাঙ্কার্হার্ষ্টের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়া পার্লামেণ্টের সভ্যদের নিকট এই দাবীকে গ্রাহ্য করাইবার জন্য সাফ্রেজিষ্ট নারীগণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমস্ত সভাসমিতিতে নারী হইয়াও তাঁহারা সেদিন পুরুষের হস্তে অতি জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হন। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত সাফ্রেজিষ্টরা যেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়াছে, সেখানেই লাঞ্ছিত হইয়াছে। মিসেস্ ডেস্পার একবার যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন একটী যুবক ঢিল ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দেয়। পচা ডিম ও ঢিল ছোঁড়া এই সমস্ত সভাসমিতির নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠে।

সাফ্রেজিষ্ট-নারীগণ কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দমিল না। পার্লামেণ্টের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। পুলিশ আসিয়া জোর করিয়া তাঁহাদের তাড়াইয়া দিতে লাগিল। অনেক সময় জোর করিয়া মেয়েদের বক্তৃতামঞ্চ হইতে নামাইয়া সভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, পুরুষ-শ্রোতাগণ হস্ত ও হস্তস্থিত ছত্র ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না।

১৯০৬ সালে মিসেস্ প্যাঙ্কার্হার্ষ্ট এবং তাঁহার কন্যা "Woman's Social and Political Union" বলিয়া একটা সঙ্ঘ স্থাপন করেন। পার্লামেণ্টের দ্বারদেশে ট্রাফালগার স্কোয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহারা পার্লামেণ্টের সদস্যদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ রীতিমত উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সাফ্রেজিষ্টরা যখন দেখিলেন যে, শুধু বক্তৃতায় কোনও ফল হইতেছে না, বরঞ্চ প্রতিদিন লাঞ্ছনা আরও নির্ম্মমতর হইতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে তাহাতে সাহায্য করিতেছে, তখন মিসেস্ প্যাঙ্কার্হার্ষ্ট নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। যাহাতে এই সমস্যার সমাধান না করিয়া বৃটীশ পার্লামেণ্ট বা ইংরাজ জনসাধারণ নিশ্চিন্ত না হইতে পারে, তাহার জন্য তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বিপ্লবীর অনুযায়ী সংগ্রামশীল কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। এতদিন তাঁহারা পুরুষের হাতে নির্য্যাতিত ও আহত হইয়া আসিয়াছিলেন—এইবার তাঁহারা আঘাত ফিরাইয়া দিবার পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইংলণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটা নিদারুণ অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য সাফ্রেজিষ্টরা বাড়ী ও গির্জ্জায় আগুন লাগাইতে লাগিল। বাড়ীর কাঁচের জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া, চিঠির বাক্সের চিঠি ধ্বংস করিয়া, সরকারী উদ্যানে মূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া, তাহারা চারিদিকে এক নিদারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিল। বিখ্যাত কিউ উদ্যানের বিশ্রাম-চত্বরটী তাহারা ভাঙ্গিয়া দিল—ন্যাশানাল গ্যালারিতে ভ্যালাস্‌কুইএর বিখ্যাত ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তিটী বিকৃত করিয়া দিল, রয়েল একাডেমিতে অতর্কিতে প্রবেশ করিয়া সার্জেণ্টের অঙ্কিত চিত্র বিনষ্ট করিয়া দিল, বৃটীশ মিউজিয়ামেরও কতকগুলি জিনিষ ধ্বংস করিল। গভর্ণমেণ্টও এই সমস্ত বিদ্রোহী নারীদের শাস্তির জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন এবং বিংশ-

শতাব্দীর প্রারম্ভে নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া অপেক্ষা তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখাই ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু কারাগারে গিয়াও এই সমস্ত বিদ্রোহী নারী গভর্ণমেণ্টকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহারা জেলে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিল। কোন মতেই তাহাদের আহার করান সম্ভব হইল না—এবং তাহার ফলে তাহাদের অনেকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন পার্লামেণ্ট (১৯১২) Prisoner Act বলিয়া একটী নূতন আইন করিলেন। এই আইনের বলে যে-কোনও কারামুক্ত বন্দীকে পুনরায় গ্রেফতার করা যাইত। যে-সমস্ত প্রায়োপবেশন-কারিণীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিত তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইত—আবার বাহিরে থাকিয়া সুস্থ হইলেই তাহাদের গ্রেফতার করা হইত। সাধারণে ইহাকে Cat and Mouse Act বলিত।

মিসেস্ পাঙ্কার্হার্ষ্ট ও তাঁহার কন্যা কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারে তাঁহারাও প্রায়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করেন। মিসেস্ প্যাঙ্কর্হার্ষ্টের তিনবৎসর কারাদণ্ড হয়। এই সমস্ত নারী-প্রায়োপবেশনকারীদের লইয়া পার্লামেণ্টে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল। লর্ড রবার্ট সিসিল বলিলেন, "এই সমস্ত ভয়ঙ্কর মেয়েদের কিছুদিনের জন্য কোনও স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখা হউক্।" স্যার আর্থার মার্কহাম্ বলিলেন, "তাহাদের সামনে প্রচুর খাদ্য রাখিয়া দেওয়া হউক; তাহারা যদি না খায়, তাহা হইলে তাহাদের সেণ্ট হেলেনায় পাঠান হউক্।" শুধু কের হার্ডি বলিয়াছিলেন, "এত দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি? তাহাদের ভোটের অধিকার দিলেই তো সকল সমস্যা মিটিয়া যায়?"

কিন্তু কের হার্ডির কথা সেদিন কেহ শোনে নাই—যদিও আজ

মাত্র কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডের জনসাধারণ মিসেস্ প্যাঙ্কার্হাষ্টের মর্ম্মর-মূর্ত্তির তলে পুষ্প-অর্ঘ্য দেয়। ১৯১২ সালে মিঃ আসকুইথ বলেন, "The grant of any franchise to woman is a political mistake of a very disastrous kind"—"নারীদের কোনও রকম ভোটাধিকার দেওয়া মানে অত্যন্ত মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করা।"

সহসা ১৯১৪ সালে সমগ্র জগৎকে রক্তশিখায় প্রজ্বলিত করিয়া মহাযুদ্ধের রণ-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এত বড় ভয়াবহ যুদ্ধ আর মানব-ইতিহাসে ঘটে নাই। রাজনৈতিক ফলাফলের বাহিরে এই মহাযুদ্ধ মানুষের চিন্তা ও ভাব-জগতে এক অভিনব পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল: পুরাতন সমস্যা মানুষ নূতনভাবে দেখিতে শিখিল—সেই সঙ্গে নূতনতর সমস্যাও জাগিয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের রক্তশিখায় প্রত্যেক জাতি নূতন করিয়া তাহার সমস্যাগুলি সমাধান করিতে বাধ্য হইল।

যে নারীকে এতদিন পুরুষ, অকর্ম্মণ্য, ভীরু বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, জাতির জীবন-মরণ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া সেই নারীর সহায়তা লইতে প্রত্যেক জাতি বাধ্য হইল। পুরুষ যাহারা ছিল—সকলকেই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন। অথচ যুদ্ধের ইন্ধন জোগাইবার জন্য যে সমস্ত কল-কারখানা চলিবে—তাহাতে কাহারা কাজ করিবে? লোকের তখন এত প্রয়োজন যে—তখন পুরুষ ও নারীর ভেদ-রেখা আপনা হইতে অপসারিত হইয়া গেল। প্রত্যেক য়ুরোপীয় জাতি তখন অবলীলাক্রমে বুঝিল যে, পুরুষের মত নারীরও রাষ্ট্রীয় সত্বা আছে।

১৯১৫ সালে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া দিলেন যে, কারখানায় মাহিনার ব্যাপারে নর ও নারীর অতঃপর আর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া আর নারীদের শ্রম অল্পমূল্যে কেনা হইবে না।

সাফ্রেজিষ্টরাও সমস্ত লাঞ্ছনা ভুলিয়া গিয়া জাতির সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কল-কারখানার সমস্ত দুরূহ কাজে সেদিন নারীর সহযোগিতার মূল্য প্রত্যেক যুধ্যমানজাতি উপলব্ধি করিয়াছিল। এমনি কি, বোমা তৈরি করার কার্য্যেও সেদিন নারী অগ্রসর হয়। শেষোক্ত কার্য্য লইয়া প্রত্যেক জাতির নারী বিশেষ সাহস ও কৃতিত্ব দেখায়।

নারীরা যখন বোমার কারখানায় যোগদান করিয়া প্রাণ-ধ্বংসী সেই সমস্ত অস্ত্র তৈয়ারী করে—তখন য়ুরোপের একদল শান্তিকামী সাহিত্যিক ও দার্শনিক একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া য়ুরোপের নারীগণের নিকট একটী আবেদন লিপিবদ্ধ করেন। যে নারী জীবনের ধাত্রী, যে নারী লোকমাতা, তাহাদের এই জীব-ধ্বংসী কার্য্যে ব্রতী করায় তাঁহারা মর্ম্মাহত হন।

মহাযুদ্ধের কথা বলিতে গেলেই এই প্রসঙ্গে একজন নারীর কথা উল্লেখ কবিতে হয়। দুঃস্থ মানবতা ও জাতির সেবার অপরাধে সে নারী সামরিক আইনের কঠোর বিধানে আত্মোৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার নাম **এডিথ ক্যাভেল।**

এডিথ ক্যাভেল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নরফোক প্রদেশের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক ক্যাভেল। বাল্যকাল হইতে সেবা-ধর্ম্মের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি থাকার দরুণ তিনি ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হাসপাতালে ধাত্রীরূপে যোগদান করেন। সেখানে কয়েক বৎসর কাজ করার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত বার্কাণ্ডেল নামক স্থানের হাসপাতালের প্রধান ধাত্রীর কর্ম্মভার লইয়া স্বদেশ ত্যাগ করেন।

মহাযুদ্ধের সময় অসহায় বেলজিয়ামের উপর যখন জার্ম্মাণ-বিক্রমের

প্রথম ধাক্কা আসিয়া লাগিল, তখন উক্ত হাসপাতাল আহত সৈন্যদের সেবার জন্য রেডক্রস হাসপাতালে পরিণত হয় এবং নার্স এডিথ ক্যাভেল তাহার তত্ত্বাবধায়করূপে রহিলেন।

সেই সময় যুদ্ধে আহত ও অকর্ম্মণ্য বৃটীশ ও ফরাসী-সৈন্যদের জার্ম্মাণ-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াইয়া স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে পাঠাইয়া দিবার জন্য প্রিন্স রেজিনাল্ড-ডি-ক্রয় একটী গোপন বন্দোবস্ত করেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদে এই সমস্ত আহত সৈন্যদের জন্য জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং সেখান হইতে গাইড দ্বারা তাহাদের নার্স এডিথ ক্যাভেলের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। ফিলিপ বাক নামক আর এক ব্যক্তির সহায়তায় এডিথ ক্যাভেল আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া এই সমস্ত সৈনিকদের অর্থ ও গাইড দিয়া ডাচ-সীমান্তে পৌছাইয়া দিতেন।

১৯১৫ সালের ৬ই আগষ্ট এডিথ কাভেলের এই ব্যাপার জার্ম্মাণ-সামরিক প্রহরীদের নজরে পড়িয়া যায় এবং উক্তদিন তিনি গ্রেফতার হন। কোর্ট মার্শালের বিচারে ১১ই অক্টোবর সকালবেলা ব্রুসেল্‌সে নার্স এডিথ ক্যাভালকে গুলী দ্বারা নিহত করা হয়।

যে মিঃ এস্‌কুইথ দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার দোহাই দিয়া বারে বারে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনকে আঘাত দিয়াছিলেন, নার্স এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলেন, "She has taught the bravest men among us a supreme lesson of courage; yes, and there are thousands of such women, but a year ago we did not know it."—"আমাদের মধ্যে সব চেয়ে নির্ভীক পুরুষকেও তিনি তাঁহার অসামান্য নির্ভীকতার দ্বারা এক নব দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন—একথা একান্ত সত্য এবং সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, তাঁহার ন্যায় বহু নারী আমাদের

চারিদিকেই আছেন—দুঃখের বিষয় মাত্র এক বৎসর আগেও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।”

মিঃ এস্‌কুইথের অজ্ঞানতার অপরাধ সংশোধন করিয়া লইলেন—পরবর্ত্তী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ। তাঁহারই আমলে ১৪ই নভেম্বর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ পার্লামেণ্টে নারীর ভোট দিবার অধিকার স্বীকার করিয়া আইন লিপিবদ্ধ হইল এবং পর বৎসর ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ-অনুমোদনের ফলে অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী এই নারী স্বাধীনতা অন্দোলনের একটা জয়যুক্ত মীমাংসা হইয়া গেল।

উক্ত বৎসরেই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুষিয়া এবং পোলাণ্ডের নারীগণ ভোটাধিকার অর্জ্জন করেন। তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯ সালে ইটালীর নারীগণ এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন। নিউজিল্যাণ্ডবাসিনীগণ কিন্তু ১৮৯৩ সাল হইতেই পুরুষের সঙ্গে সমাজে এই নাগরিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আন্দোলন সুরু হয় এবং তাহার মীমাংসা হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২ শে সেপ্টেম্বর। বৃটীশ উপনিবেশের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার রমণী সকলের আগে ১৯০২ সাল হইতে এই সৌভাগ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহার পর কানাডা—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এবং আফ্রিকায় জামাকা, রডেসিয়া এবং বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই অধিকার লাভ করে। কিন্তু ভারতনারী আজও সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত।

লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের নারী-প্রতিনিধিরূপে **বেগম শাহ্‌ নাওয়াজ** ভারতনারীর এই নাগরিক মর্য্যাদার দাবীর কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে

পার্লামেণ্টেয় সদস্য হইবার অধিকার দিয়া আর একটী বিল পাশ হয় তাহার ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে **লেডী আষ্টর** প্লাইমাউথ হইতে সর্ব্বপ্রথম নারী-সদস্যরূপে পার্লামেণ্ট গৃহে প্রবেশ করেন। আজ ১৯৩০ সালে বর্ত্তমান পার্লামেণ্টে ১৫ জন নারীসদস্য রাজকার্য্য পরিচালনায় সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিতেছেন।

কিন্তু এই আইন সত্ত্বেও আর একটী ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না—তাহা আইন-ব্যবসায়। মিঃ লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রী-সভার পর যখন ইংলণ্ডে শ্রমিক-মন্ত্রী-সভা গঠিত হইল, তখন Sex Disqualification Removal Act নামে আর একটী নূতন আইন প্রণীত হয় এই আইনের বলে নারীগণ আইন অধ্যয়ন এবং ফৌজদারী এবং দেওয়ানী দুই বিভাগেই প্র্যাক্‌টিস্ করিতে সক্ষম হইলেন। জুরীর বিচারে এত দিন পর্য্যন্ত কোনও নারীকে জুরী করা হইত না, কোনও নারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেও পারিতেন না। এই নূতন আইনের বলে নারীর সে বাধাও বিদূরিত হইল। এই আইনের ফলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত নারী আইন অধ্যয়ন ও আইন-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে **Mrs. Gwyneth Morjory Thomson** এর নাম সর্ব্বপ্রথমে আসে। ১৯২০ সালের প্রথমদিনে ব্যারিষ্টার পদাভিলাষী হইয়া ইংলণ্ডের মহিলাদের পক্ষ হইতে ইনি সর্ব্বপ্রথম লিন্‌কলন্‌স্ ইনে প্রবেশ করেন। উক্ত বৎসর মে মাসে ভারতীয় নারীদের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম **মিস টাটা** লিন্‌কল্‌নস্ ইনে প্রবেশ করেন। তাহার তিনমাস পরে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রিষ্টলের আদালতের এক বিচারে দুইজন নারীকে জুরী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বর্ত্তমান বৎসর (১৯৩০) **বেগম ফারুকী** লিন্‌কলন্‌স্ হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া প্রিভিকাউন্সিলে প্রাক্‌টিস্ করিবার অধিকার পাইয়াছেন। প্রিভিকাউন্সিলে আইনব্যবসায়ীরূপে

ভারতীয় নারীর এই প্রথম প্রবেশ। ভারতে **কুমারী শ্যাম নেহরু** ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া এলাহবাদে বিশেষ যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারী করিতেছেন

আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পরিধির মধ্যে যখন নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন এরূপ ব্যাপকভাবে দেশদেশান্তরে সমাজের ও রাষ্ট্রের কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া আপনার সহজ প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছিল, সেই সময় ইংলণ্ডের দুই প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ মধ্যযুগের মনোবৃত্তি লইয়া নারীদের উপাধিদানে অসম্মত হয় এবং ফ্রান্স ম্যাদাম কুরীর মত বিশ্বজয়ী প্রতিভাকে নারী বলিয়া ফরাসী একাডেমীর সদস্য পদ হইতে বঞ্চিত করে। অবশেষে ১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের, বি-এ, এম-এ, প্রভৃতি উপাধি দিতে স্বীকৃত হন। তাহার পর বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি, সি, এল. উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রথম **রাণী মেরীকে** ভূষিত করেন।

পাশ্চাত্য আদর্শে বলিষ্ঠ এই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন কিন্তু বর্ত্তমান মানবের নিকট আর এক সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। এই আন্দোলন একদিকে যেমন নারীর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, আর দিকে তেমনি এই নব-মুক্তির মাদকতায় নারী স্ব-ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া এই আন্দোলনকে পুরুষের সমকক্ষতার প্রতিযোগিতায় এক কল্যাণহীন পরিণতির দিকে লইয়া চলিয়াছে। আপনার রাষ্ট্রীয় মুক্তির অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য-নারী আজ তাহার গৃহ-লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্ত্তিকে হারাইয়া ফেলিতে চলিয়াছে। আজ নারীর নাগরিক মূর্ত্তি তাই তাহার জননীর আদি-স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চালিয়াছে। তাই জগত-খ্যাত নারী-সমাজতত্ত্ববিদ্ **এলেন কাই** মাতৃত্বের অমিলন

প্রতিমাকে পুনরায় বর্ত্তমান সভ্যতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য য়ুরোপে এক নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করেন।

সমাজ-দত্ত বাধার হাত হইতে মুক্তি অর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য-নারী আজ প্রকৃতি-দত্ত বাধার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। যে-সমস্ত কর্ম্ম ও বৃত্তি পুরুষের প্রকৃতি-সিদ্ধ, নব্য নারী সেখানেও আত্ম-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কুমারী **এ্যামী জনসন** এরোপ্লানে করিয়া একা অষ্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার দেখাদেখি বহু নারী এই প্রচেষ্টায় রত আছেন; **কুমারী মার্জরী ফষ্টার** গুলি ছোড়ায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের বিখ্যাত King's prize লাভ করিলেন—লণ্ডনের রাস্তায় পুরুষরা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিল---**মিস্ উনি ফ্রেড ব্রাউন** পুরুষদের সহিত এরোপ্লান চালনা প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন—**মিস্ আইভি হক, মিসেস্ কারসন, মিসেস্ জিল, মিস্ জার্টুরুড এডারলি জিল,** মিস্ জার্টরুড এডারলি প্রভৃতি পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলিশ চ্যানালে সাঁতার দিয়া পার হইলেন, **মিস্ ওয়াকার** দৌড়-প্রতি-যোগিতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন—ব্যক্তিগত দিক দিয়া হয়ত এই সমস্ত গৌরব আত্মশ্লাঘার বিষয়; কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য পাশ্চাত্য নারী-সমাজের মধ্যে যে সমস্ত নূতন প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে বহু য়ুরোপীয় দার্শনিক ও চিন্তা-নায়ক য়ুরোপের নির্ব্বাপিত মঙ্গল-দীপ গৃহের দিকে চাহিয়া আজ ব্যাকুল প্রশ্ন করিতেছেন, হে কল্যাণী, হে স্বর্গের দূতী, এ তুমি কোথায় চলিয়াছ ?

## গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

# পণ্ডিত মতিলাল

একদিন যে ব্যক্তি প্যারিস হইতে কাপড় ধোয়াইয়া আনিতেন, কেমন করিয়া সেই বিলাসী শ্রেষ্ঠ ও ধনী, জাতির কল্যাণ-কামনায় তিল তিল করিয়া নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন—এই পুস্তকে বিংশ-শতাব্দীর সেই রাজর্ষির অপরূপ জীবনকাহিনী একান্ত সরস করিয়া বলা হইয়াছে। মূল্য মাত্র আট আনা।

# আবিষ্কারের কথা

কেমন করিয়া দুঃসাহসী নাবিক আর পর্য্যটকগণ জীবন বিপন্ন করিয়া এবং অনেক সময় জীবন সমর্পণ করিয়াও, দুর্গম-গিরি-কান্তার আর জনহীন মরভূ পার হইয়া, দেশ-দেশান্তর আবিষ্কার করিয়াছে, এই পুস্তকে সেই সমস্ত রোমাঞ্চ-কর অপূর্ব্ব কাহিনী নানা চিত্র সমেত কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত করিয়া লেখা হইয়াছে। মূল্য মাত্র আট আনা।

যাঁহার একটী গীতে
একদিন জড়ত্ব-শাপযুক্ত বাঙ্গালীর জীবনে উৎসাহ, উদ্যম,
আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস—জাতীয় জীবনগঠনের
প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সেই

## "বন্দেমাতরম্"

মন্ত্রের ঋষি

# বঙ্কিমচন্দ্র

তাহার পূত-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্কিম-স্নেহ-পুষ্ট—বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র—প্রবীণ সুসাহিত্যিক
**শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত**

# বঙ্কিম-জীবনী

**বাঙ্গালীর—বাঙ্গালার—তথা ভারতের
বিশ্বসাহিত্যের মুকুটমণি।**

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের প্রচেষ্টায় এই "বঙ্কিম-জীবনী" সম্পূর্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী-প্রসূত সমস্ত উপন্যাসগুলির সমালোচনা ও বহু অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের জন্য লিখিত পরিচ্ছেদও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বহু মনীষীর প্রতিকৃতি শোভিত। সুবৃহৎ পুস্তক। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সুশোভন। মূল্য তিন টাকা

শরচ্চন্দ্র-চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা